শিক্ষাপ্রসঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আষাঢ়, ১৩৬২

এক টাকা আট আনা

নিবেদন

শিক্ষাসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার গভীরচিন্তাপ্রসূত শিক্ষাদর্শ নব্যভারতের গঠনমূলক কার্য্যে ও শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে এবং বালক-বালিকাগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধানে কিরূপ সহায়তা করিতে পারে তাহা তাঁহার ভাবগম্ভীর উক্তিসকলের মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাসম্বন্ধে স্বামীজীর এই তথ্যপূর্ণ বাণীসমূহ সংগ্রহ ও উহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া প্রবন্ধাকারে 'শিক্ষা-প্রসঙ্গ' নামে প্রকাশ করা হইল। যাহাতে এই প্রসঙ্গের ধারাবাহিকত্ব ভঙ্গ না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহার মৌলিক বাণীসকল সংকলিত ও পরপর সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রত্যেক জাতির উত্থানের মূলে রহিয়াছে—শিক্ষা। যে দেশ যত শিক্ষিত সে দেশ সর্ব্ববিষয়ে তত শক্তিসঞ্চয় করিয়া জাতি-সংঘে গৌরবাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ। স্বামীজী শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "**Education is the manifestation of the perfection already in man**"—প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে তাহাই যাহা মানবপ্রকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার পূর্ণতা-বিকাশের সহায়ক হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে শিক্ষার আদর্শকে দেখিতে চেষ্টা করিলে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে স্বামীজীর শিক্ষাসম্বন্ধীয় মত ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে। আজ বিভিন্ন চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবাসী যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার জন্য শুধু বিদেশীকেই দায়ী করিলে চলিবে না। ইহার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী আমরা

নিজেরাও। আমরাই আমাদের ভাই-ভগ্নীকে সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে দূরে রাখিয়া তাহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী, দুর্ব্বল ও আত্মশ্রদ্ধাহীন করিয়া তুলিয়াছি। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের সার্ব্বভৌম আদর্শ—ধর্ম্ম ও দর্শন, যাহা আমাদের সমাজ-শরীর-গঠনের পক্ষে অফুরন্ত নির্ঝরস্বরূপ, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ার ফলেই আমাদের নৈতিক ও সামাজিক জীবন এত নিম্নস্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাসই মানুষকে শক্তিশালী করিয়া তোলে; —ইহাই স্বামীজীর ভাষায় "man-making education," —প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট উপাদান।

কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে ভারতের শিক্ষা কেবল ধর্ম্মশিক্ষায় পর্য্যবসিত না হয়। একটা জাতিকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি দুনিয়ার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে হয়, তবে তাহাকে বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া শুধু নিজের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। স্বামীজী প্রতীচ্য সভ্যতার সহিত পরিচয় লাভ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতের জাতীয় জীবন পরিপুষ্ট করিতে হইলে পাশ্চাত্ত্যজগতের জড়-বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। তাই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের —"বেদান্ত ও বিজ্ঞানের"—অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতীচ্যের যান্ত্রিক সভ্যতার সবটাই তিনি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যতটুকু গ্রহণ করিলে ভারতকে জীবন-সংগ্রামে শক্তিশালী করিয়া তোলা সম্ভব, অথচ যাহাতে জড়বিজ্ঞানের বিষময় ফল এদেশে প্রসর্পিত হইয়া এদেশকে প্রতীচ্যের মত জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতে না পারে, তজ্জন্যই তিনি বৈজ্ঞানিক

ও যান্ত্রিক সভ্যতাকে ভারতের ধর্ম্মমূলক সনাতন শিক্ষাপদ্ধতির পরিপূরকরূপে মাত্র গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

স্বামীজী স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও উদাসীন ছিলেন না। বিজাতীয় সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা প্রতি ঘরে ঘরে মাতৃ-জাতির আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছি না। ভারতীয় নারীদিগের জন্য স্বামীজী এমন শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন যাহার সাহায্যে তাঁহারা পবিত্র, সংযত, নিঃস্বার্থপর ও ধর্ম্মপরায়ণা হইবেন এবং সন্তানহৃদয়ে বল ও উৎসাহ ঢালিয়া দিয়া ভারতীয় জাতিকে পুনরায় আত্মস্থ ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন। ভারত-কৃষ্টির মূলভিত্তি সংস্কৃত-শিক্ষাবিস্তার এবং জনসাধারণের সম্যক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত নির্দ্দেশসমূহ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অধিকন্তু প্রকৃত শিক্ষার বাহন দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী ও সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত চরিত্রবান শিক্ষক তৈরী করিবার গুরুদায়িত্বভারও তিনি দেশবাসীর উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজীর এই শিক্ষাদর্শ স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির পথে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে পারে এবং দেশের ছাত্র, ছাত্রী ও বিদ্যোৎসাহিগণকে প্রকৃত পন্থার সন্ধান দিয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্যই তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় বচনাবলী চয়ন করিয়া বাণীর মন্দিরে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল। এই পুস্তকপাঠে দেশবাসী স্বামীজীর শিক্ষাদর্শানুযায়ী স্ব স্ব জীবন গড়িয়া তুলিতে উৎসাহবোধ করিলে আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

রথযাত্রা
১৩৬২

প্রকাশক

সূচীপত্র

শিক্ষার মূলতত্ত্ব	...	...	১
শিক্ষালাভের উপায়	..	...	১৪
শিক্ষার উদ্দেশ্য :			
(১) চরিত্রগঠন	...	...	৩৩
(২) মানুষ তৈয়ার করা	...	...	৪৪
বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ ও তন্নিরাকরণের উপায়		...	৫৬
ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	...	...	৬৪
শিক্ষক ও ছাত্র	...	...	৯১
স্ত্রী-শিক্ষা	...	...	১০২
জন-শিক্ষা	...	...	১২৫
আমেরিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-প্রণালী		...	১৬১

মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্ত্তমান তাহারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা।

* * *

যে-সকল আবরণ মানুষের অভ্যন্তরে জ্ঞান ও শক্তি-প্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান, সেই আবরণসমূহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায়সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

* * *

শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়াকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শিক্ষার মূলতত্ত্ব

ইউরোপের বহু নগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন।

শিক্ষার অর্থ—অন্তরের বিকাশ

মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্ত্তমান তাহারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা। মানুষের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখন জ্ঞানী বা শক্তিমান হইতে পারিত না। বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায়সকল তাহার অন্তরে কোনপ্রকার জ্ঞান বা শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু যে সকল আবরণ তাহার অভ্যন্তরে জ্ঞান ও শক্তি-প্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান, সেই সকলকে অপসারিত করিতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে। ঐ আবরণসমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি শত-সহস্রমুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে সর্ব্বজ্ঞ এবং জগৎ-সৃষ্টি-কর্তৃত্ব ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত করিয়া তুলে। অতএব ঐ আবরণসমূহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায়সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত করিবার যোগ্য।

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর—ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতর—অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রহিয়াছে। জ্ঞান স্বতঃই বর্ত্তমান রহিয়াছে, মানুষ কেবল উহা আবিষ্কার করে মাত্র। জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। আমরা যে বলি, মানুষ 'জানে', ঠিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে—আবিষ্কার করে। মানুষ যাহা 'শিক্ষা' করে, প্রকৃতপক্ষে সে উহা আবিষ্কার করে। Discover (আবিষ্কার) শব্দের অর্থ—অনন্তজ্ঞানের খনি-স্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা কি এক কোণে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনেই অবস্থিত ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন। জগৎ যত প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সমুদয়ই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকালয় তোমার মনে। বহির্জ্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক কারণ—উপযোগী অবস্থাস্বরূপ, কিন্তু সকল সময়ই তোমার নিজ মনই তোমার অধ্যয়নের বিষয়। আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক কারণস্বরূপ হইল, তখন তিনি নিজ মন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মনের ভিতরকার পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত ভাব-পরম্পরারূপ শৃঙ্খলগুলি পুনরায় আর একভাবে সাজাইতে লাগিলেন, এবং উহাদের ভিতর আর একটি শৃঙ্খল আবিষ্কার করিলেন। উহাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। উহা আপেল অথবা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল না। অতএব

ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। আর একটি জিনিস আবশ্যক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বাহিরের বস্তু যেন আমার অন্তরে সংবাদ-প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির নিকট উহা অর্পণ করিল, বুদ্ধি পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত মনের সংস্কার অনুসারে উহাকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়া-প্রবাহ প্রেরণ করিল, ঐ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। মনে যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে তাহাকে বুদ্ধি বলে। তথাপি এই বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইল না। মনে কর একটি ক্যামেরা (camera) রহিয়াছে, আর একটি বস্ত্রখণ্ড রহিয়াছে। আমি ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর একটি চিত্র ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি? আমি ক্যামেরা হইতে নানাপ্রকার আলোক-কিরণ ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর ফেলিতে এবং ঐ স্থানে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটি অচল বস্তুর আবশ্যক, যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে পারে। কোন সচল বস্তুর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব—কোন স্থির বস্তুর প্রয়োজন। কারণ আমি যে আলোক-কিরণগুলি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি সচল ; এই সচল আলোক-কিরণগুলিকে কোন অচল বস্তুর উপর একত্রীভূত, একীভূত করিয়া মিলিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়-গণ ভিতরে যে সকল অনুভূতি লইয়া মনের নিকট এবং মন বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ যতক্ষণ না এমন কোন বস্তু পাওয়া যায়, যাহার উপর এই চিত্র দেখিতে পারা যায়, যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একত্রীভূত, মিলিত হইতে পারে,

ততক্ষণ এই বিষয়ানুভূতিও সম্পূর্ণ হইতেছে না। কি সে বস্তু, যাহা সমুদয়কে একটি একত্বের ভাব প্রদান করে? কি সে বস্তু, যাহা বিভিন্ন গতির ভিতরও প্রতি মুহূর্তে একত্ব রক্ষা করিয়া থাকে? কি সে বস্তু, যাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি যেন একত্র গ্রথিত থাকে, যাহার উপর বিষয়গুলি আসিয়া যেন একত্র বাস করে এবং এক অখণ্ডভাব ধারণ করে? আমরা দেখিলাম এমন কিছুর আবশ্যক, আর সেই কিছু শরীর মনের তুলনায় অচল হওয়া আবশ্যক। যে বস্তুখণ্ডের উপর ঐ ক্যামেরা চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে, তাহা ঐ আলোক-কিরণগুলির তুলনায় অচল, তাহা না হইলে কোন চিত্র হইবে না। অর্থাৎ ইহা একটি ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক।[১] এই কিছু, যাহার উপর মন এই সকল চিত্রাঙ্কন করিতেছে—এই কিছু, যাহার উপর মন ও বুদ্ধিদ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের বিষয়ানুভূতিসকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্রীভূত হয়, তাহাকেই মানুষের আত্মা বলে।

আর একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা করা যাক। সম্মুখে এই কুঁজাটি দেখিতেছি। এখানে ঘটিতেছে কি? ঐ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোক-কিরণ আসিয়া আমার চক্ষে প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষিজালের (retina) উপর একটি চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে। আর ঐ ছবি যাইয়া আমার মস্তিষ্কে উপনীত হইতেছে। শারীরবিধানবিদ্‌গণ যাহাদিগকে অনুভবাত্মক স্নায়ু বলেন, তাহাদিগের দ্বারা ঐ চিত্র ভিতরে মস্তিষ্কে নীত হয়। কিন্তু তথাপি তখন পর্যন্ত দর্শনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এ

১ That is to say, the perceiver must be an individual.

পর্য্যন্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আসে নাই। মস্তিষ্কাভ্যন্তরীণ স্নায়ুকেন্দ্র উহাকে মনের নিকট লইয়া যাইবে, আর মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়া হইবামাত্র ঐ কুঁজা আমার সম্মুখে ভাসিতে থাকিবে। প্রতিক্রিয়া হইলেই উহাদের জ্ঞান আসিবে—তখনই আমরা দেখিতে, শুনিতে এবং অনুভব প্রভৃতি করিতে সমর্থ হইব। এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।

তোমরা সকলেই জান, কিরূপে বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে দেখ, ইন্দ্রিয়দ্বারস্বরূপ বাহিরের যন্ত্রগুলি রহিয়াছে, পরে ঐ ইন্দ্রিয়-গোলকাদির অভ্যন্তরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গুলি—ইহারা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রগুলির সহায়তায় শরীরের উপর কার্য্য করিতেছে, তৎপরে মন। যখন এই সমুদয় সমবেত হইয়া কোন বহির্বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা সেই বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আবার মনকে একাগ্র করিয়া কেবল কোন একটি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখা অতি কঠিন, কারণ মন বিষয়ের দাসস্বরূপ।

চিত্তসংযম ও একাগ্রতা

আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে, 'সাধু হও', 'সাধু হও', 'সাধু হও'। বোধ হয় জগতে এমন কোন লোক নাই যে, 'মিথ্যা কহিও না', 'চুরি করিও না' ইত্যাদিরূপ শিক্ষা পায় নাই। কিন্তু কেহ তাহাকে এই সকল অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা দেয় না, শুধু কথায় হয় না। কেনই বা সে চোর না হইবে? আমরা ত তাহাকে চৌর্য্যকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি চুরি করিও না। মনঃসংযম

করিবার শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতেই তাহার শিক্ষা ও উপকার হইয়া থাকে। যখন মন ইন্দ্রিয়-নামধেয় ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই সমুদয় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম হইয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক আর অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, মানুষ নিজ মনকে ভিন্ন ভিন্ন (ইন্দ্রিয়-নামধেয়) কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন করিতে বাধ্য হয়। এই জন্যই মানুষ নানাপ্রকার-দুষ্কর্ম্ম করে, করিয়া শেষে কষ্ট পায়। মন যদি নিজের বশে থাকিত, তবে মানুষ কখনই অন্যায় কর্ম্ম করিত না। মনঃসংযম করিবার ফল কি? ফল এই যে, মন সংযত হইয়া গেলে সে আর তখন আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়রূপ বিষয়ানুভূতি-কেন্দ্রগুলিতে সংযুক্ত করিবে না। তাহা হইলেই সর্ব্বপ্রকার ভাব ও ইচ্ছা আমাদের বশে আসিবে।

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা। রসায়নতত্ত্বান্বেষী নিজের পরীক্ষাগারে গিয়া নিজের মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, তিনি যে সকল বস্তু বিশ্লেষণ করিতেছেন, তাহাদের উপর প্রয়োগ করেন এবং এইরূপে বাহ্যবস্তুর রহস্য অবগত হন। জ্যোতির্ব্বিদ্ নিজের মনের সমুদয় শক্তি একত্রিত করিয়া তাহাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া আকাশে প্রক্ষেপ করেন আর অমনি নক্ষত্র, সূর্য্য, চন্দ্র সকলেই আপনাপন রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি যে বিষয়ে কথা বলিতেছি, সে বিষয়ে আমি যতই মনোনিবেশ করিব, ততই সেই বিষয়ের রহস্য আমার নিকট প্রকাশিত হইতে থাকিবে। তোমরা আমার কথা শুনিতেছ; তোমরাও যতই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে, ততই আমার কথা ধারণা করিতে পারিবে।

ব্যবহারিক বা পারমার্থিক সমুদয় জ্ঞানই মানুষের মনে। অনেকস্থলেই উহারা আবিষ্কৃত (অনাবৃত) থাকে না, বরং আবৃত থাকে। যখন এই আবরণ অল্প অল্প করিয়া সরাইয়া লওয়া হয়, তখন আমরা বলি 'আমরা শিক্ষা করিতেছি', আর এই আবিষ্করণ-প্রক্রিয়া যতই চলিতে থাকে, ততই জ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে। যে পুরুষের এই আবরণ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী; যে ব্যক্তির আবরণ খুব বেশী, সে অজ্ঞান; আর যে মানুষ হইতে উহা একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। প্রাচীনকালে অনেক সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, আমার বিশ্বাস—একালেও অনেক হইবেন, আর আগামী যুগসমূহেও অসংখ্য সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। যেমন একখণ্ড চকমকিতে অগ্নি অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান মনের মধ্যেই রহিয়াছে, উদ্দীপক কারণটি ঘর্ষণস্বরূপে সেই অগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন শুক্তিতে মুক্তার সৃষ্টি—সেইরূপ মনও গঠিত। শুক্তির মধ্যে একটু ধূলি ও বালুকণা প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে, আর শুক্তির দেহ উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকাকে নিজ শরীর-নিঃসৃত রসে প্লাবিত করিতে থাকে। উহাই তখন নির্দ্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়। এই মুক্তা যেরূপে গঠিত হয়, আমরা সমগ্র জগৎকে ঠিক সেইভাবে গঠন করিতেছি। বাহ্যজগৎ হইতে আমরা কেবল আঘাত মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এমন কি, সেই আঘাতটির অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করিতে হয়; আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃত-পক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনের অংশবিশেষকেই সেই আঘাতের

দিকে প্রেরণ করি, আর যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি, তাহা আর কিছুই নয়। আমাদের নিজ মন ঐ আঘাতের দ্বারা যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই আকারপ্রাপ্ত মনকেই জানিতে পারি।

সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, বাহিরে নহে। যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি উহা একখানি প্রতিচ্ছবির আরশি—উহাই মাত্র প্রকৃতির কাজ—আর জ্ঞান হইল এই প্রকৃতিরূপ আরশিতে অন্তর্নিহিতের প্রতিচ্ছায়া। আমরা যাহাকে শক্তি, প্রকৃতির রহস্য এবং বল বলি, সমস্তই অন্তর্নিহিত। বহির্জগতে কতকগুলি ধারাবাহিক পরিবর্তন মাত্র। প্রকৃতিতে কোন জ্ঞান নাই; সমস্ত জ্ঞান মানুষের আত্মা হইতে আসে। মানুষ জ্ঞান প্রকাশ করে, তাহার অন্তরে আবিষ্কার করে—এ সমস্ত পূর্ব্ব হইতেই অনন্তকাল যাবৎ রহিয়াছে।

আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই দুর্ব্বলতা শিক্ষা দিতেছে; জন্মাবধিই আমি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্ব্বল। এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যুক্তি-বিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবল আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে সকল জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, তাহারা কোথা হইতে আসিয়া থাকে? উহারা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। বহির্দ্দেশে কোন্ জ্ঞান আছে? কিছুই না। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল।

কেহ কখন জ্ঞানের সৃষ্টি করে নাই। মানুষ উহা আবিষ্কার করে, উহাকে ভিতর হইতে বাহির করে, উহা তথায়ই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা ঐ সর্ষপবীজের অষ্টমাংশের তুল্য ঐ ক্ষুদ্র বীজে রহিয়াছে—ঐ মহাশক্তিরাশি তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর অত্যদ্ভুত প্রখরা বুদ্ধি কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করে, তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি ইহা সত্য। আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল অব্যক্তভাবে, কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই; অতএব সিদ্ধান্ত এই—মানুষের আত্মার ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে, কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষা মাত্র।

প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজেকে নিজে শিক্ষা দিতে হইবে—বাহিরের আচার্য্য কেবল উদ্দীপক কারণ মাত্র। সেই উদ্দীপনা দ্বারা আমাদের অন্তর্য্যামী আচার্য্য আমাদিগকে সমুদয় বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য উদ্বোধিত হন। তখন সমুদয় আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়; সুতরাং সমুদয়ই স্পষ্ট হইয়া আসে। তখন আমরা নিজেদের আত্মার ভিতরে ঐ তত্ত্বসকল অনুভব করিব এবং অনুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হইবে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছা।

ইচ্ছাশক্তির বিকাশ

এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে জন্মায়, ভোজন-পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেইপ্রকার; এমন কি, মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এ কঠোর শিক্ষায় একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটি এই যে, দুটি-একটি কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্লায়াসে সুন্দররকমে লোকে করিতে পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকতক কাষ্ঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের একটাকা দামের তাঁত ও একটা গর্ত্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০৲ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ—তাহাতে রেড়ীর তেল, এই উপাদান সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এ দেশেই হয়। খেঁদা-বোচা স্ত্রীর উপর সর্ব্বসহিষ্ণু মমত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এ দেশেই হয়। এই ত গেল গুণ। কিন্তু এই সমস্তগুলিই প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া মনুষ্যে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারে নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখনও কাটে না, প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না,

মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলগাড়ীর ইঞ্জিন—তাহারাও জড়, চলে ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটি রেলগাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটি চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়—পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্ব্বোচ্চ।

বিদ্যাশিক্ষা কাহাকে বলি? বই পড়া?—না। নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন?—তাহাও নয়। যে শিক্ষাদ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। অন্যান্য সকল জিনিসের অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির সমক্ষে আর সমস্তই নিঃশক্তি হইয়া যাইবে, কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি—সর্ব্বশক্তিমান। কেবল ইচ্ছাশক্তিতেই সব হইবে। অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ আবৃত ও অস্পষ্ট হইয়া আছে। যেন একটি লোহার পিপার ভিতর একটি আলো রাখা হইয়াছে, ঐ আলোর এতটুকু জ্যোতিঃও বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। একটু একটু করিয়া পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা

অভ্যাস করিতে করিতে আমরা ঐ মাঝখানকার আড়ালটিকে খুব পাতলা করিয়া ফেলিতে পারি। অবশেষে উহা কাচের মত স্বচ্ছ হইয়া যায়।

আমরা আরশিতেই আমাদের মুখ দেখিতে পাই—সমুদয় জ্ঞানও সেইরকম যাহা বাহিরে প্রতিবিম্বিত হয় তাহারই জ্ঞান। ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহারা বিশ্বাস করে যে, শক্তি পবিত্রতা বা পূর্ণতা বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। ঐগুলি আমাদের জন্মগত অধিকার—আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ অপবিত্রারূপ আবরণের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যথার্থ যাহা তাহা অনাদিকাল হইতেই পূর্ণ অচল অটল সুমেরুবৎ। ভগবান ও মানবে, সাধু ও পাপীতে প্রভেদ কিসে? —কেবল অজ্ঞানে। অজ্ঞানেই প্রভেদ হয়। সর্ব্বোচ্চ মানব ও তোমার পদতলে অতিকষ্টে সঞ্চরণকারী ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যে প্রভেদ কিসে? —অজ্ঞানেই এই প্রভেদ করিয়াছে। কারণ অতিকষ্টে বিচরণশীল ঐ ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও অনন্তশক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতা—এমন কি, সাক্ষাৎ অনন্ত ভগবান রহিয়াছেন। এখন উহা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে—উহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। আমাদের সাধারণ জ্ঞানও, উহা বিদ্যা বা অবিদ্যা যেরূপেই প্রকাশিত হউক না, সেই চিতের, সেই জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশমাত্র; উহাদের বিভিন্নতা প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, যাহা তোমার পাদদেশের নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞানে ও স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম দেবতার জ্ঞানে প্রভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। আমাদের পদতলবিহারী ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মহত্তম ও উচ্চতম সাধু পর্য্যন্ত

সকলেরই ভিতর অনন্তশক্তি, অনন্ত পবিত্রতা ও সমুদয় গুণই অনন্ত পরিমাণে রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। কীটে সেই মহাশক্তির অতি অল্প পরিমাণ বিকাশ হইয়াছে, তোমাতে তদপেক্ষা অধিক, আবার অপর একজন দেবতুল্য মানবে তদপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে—এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু সকলেতেই সেই এক শক্তি রহিয়াছে। পতঞ্জলি বলিতেছেন—'ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ' (৪।৩)। কৃষক যেরূপে তাহার ক্ষেত্রে জল সেচন করে। কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জল আনিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট জলাশয় হইতে একটি প্রণালী কাটিয়াছে। ঐ প্রণালীর মুখে একটি দরজা আছে—পাছে সমুদয় জল গিয়া ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া দেয়, এইজন্য ঐ দরজা বন্ধ রাখা হয়। যখন জলের প্রয়োজন হয়, তখন ঐ দরজাটি খুলিয়া দিলেই জল নিজ শক্তিবলেই উহার ভিতরে প্রবেশ করে। জল প্রবেশের শক্তিবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই, জলাশয়ের জলে পূর্ব্ব হইতেই ঐ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার রহিয়াছে, কেবল এই দ্বার—দেহরূপ এই দ্বার—আমরা প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে দিতেছে না। আর যতই এই দেহের গঠন উন্নত হইতে থাকে, যতই তমোগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়, ততই এই শক্তি ও শুদ্ধত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে, আর এই কারণেই আমরা পানাহার সম্বন্ধে এত সাবধান।

শিক্ষকের কর্ত্তব্য

একটা চারাগাছকে জন্মাতে দেওয়া যেমন, তদপেক্ষা বেশী তুমি একটি শিশুকে শিক্ষা দিতে পার না। যাহা কিছু তুমি করিতে পার সমস্তই 'না'-এর দিকে—তুমি সাহায্য করিতে পার মাত্র। ভিতর হইতে এই প্রকাশ হয়; ইহা ইহার নিজ প্রকৃতিমত বৃদ্ধি পায়।—তুমি ইহার বাধাগুলি দূর করিতে পার মাত্র। মনে কর, আমি একটি ছোট বালক। আমার বাবা একখানি ছোট বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন—ঈশ্বর এই রকম, অমুক জিনিস এই এই রকম। কেন, আমার মনে ঐসব ভাব ঢুকাইয়া দিবার তাঁহার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল? আমি কিভাবে উন্নতিলাভ করিব, তাহা তিনি কিরূপে জানিলেন? আমার প্রকৃতি অনুসারে আমি কিরূপে উন্নতিলাভ করিব, তাহার কিছু না জানিয়া তিনি আমার মাথায় তাঁহার ভাবগুলি জোর করিয়া ঢুকাইবার চেষ্টা করেন—আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি, আমার মনের বিকাশ কিছুই হয় না। তোমরা একটি গাছকে কখন শূন্যের উপর অথবা উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বসাইয়া ফলাইতে পার না। যেদিন তোমরা শূন্যের উপর গাছ জন্মাইতে সক্ষম হইবে সেইদিন তোমরা একটা ছেলেকেও তাহার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া জোর করিয়া তোমাদের ভাব শিখাইতে পারিবে।

বালক নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে তোমরা তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে সাহায্য করিতে পার। তোমরা তাহাকে সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া সাহায্য করিতে পার না, তাহার উন্নতির বিঘ্ন দূর করিয়া 'নেতি' মার্গে (পরোক্ষভাবে)

সাহায্য করিতে পার। জ্ঞান স্বয়ংই তাহার মধ্যে, প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিতে পার, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে; উহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া দিতে পার; এইটুকু দেখিতে পার যে, অতিরিক্ত হিমে বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট হইয়া না যায়—ব্যস্, তোমার কার্য্য এইখানেই শেষ। উহার বেশী আর কিছু তুমি করিতে পার না। উহা নিজ প্রকৃতিবশেই সূক্ষ্মবীজ হইতে স্থূল বৃক্ষাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বালকদের শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ। বালক নিজে নিজেই শিক্ষা পাইয়া থাকে। তোমরা আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছ, যাহা শুনিলে, বাড়ী গিয়া নিজ মনের চিন্তা ও ভাবগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখিবে, তোমরাও চিন্তা করিয়া ঠিক সেইভাবে—সেই সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়াছ। আমি কেবল সেইগুলি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। আমি কোনকালে তোমাকে কিছু শিখাইতে পারি নাই। তোমাদিগকে নিজেদের শিক্ষা নিজেই করিতে হইবে—হয়ত আমি সেই চিন্তা, সেই ভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া তোমাদিগকে একটু সাহায্য করিতে পারি।

শিক্ষায় স্বাধীনতা

আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার আমার পিতার কি অধিকার আছে? আমার প্রভুর এই সব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে? এসব জিনিস আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে? হইতে পারে ওগুলি ভাল ভাব, কিন্তু আমার রাস্তা ও না হইতে পারে।

লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে এইরূপে নষ্ট করা হইতেছে। মানুষ অপরের কতটা অনিষ্ট করিয়া থাকে ও করিতে পারে, তাহা সে জানে না। প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে কি প্রবল শক্তি রহিয়াছে, তাহা সে জানে না। এই প্রাচীন উক্তিটি সম্পূর্ণ সত্য যে, 'দেবতারা যেখানে যাইতে সাহস করেন না, নির্ব্বোধেরা সেখানে বেগে অগ্রসর হয়।' গোড়া হইতেই এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা। পিতামাতার অসঙ্গত শাসনের জন্য আমাদের ছেলেরা স্বাধীনভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সুবিধা পায় না। জোর করিয়া সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে তাহাতে সংস্কার বা উন্নতির গতি রোধ হয়। তুমি কাহাকেও বলিও না—'তুমি মন্দ,' বরং তাহাকে বল—'তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও'। যদি তুমি কাহাকে সিংহ হইতে না দাও, তাহা হইলে সে ধূর্ত্ত শৃগাল হইয়া দাঁড়াইবে। কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে ও নিজের স্বভাবানুযায়ী বাড়িতে থাকে, তুমি সেইভাবে অপরের কল্যাণসাধন করিতে পার। কেহ কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষক শিখাইতেছি মনে করিয়াই সব মাটি করে। বেদান্ত বলে, এই মানুষের ভিতরেই সব আছে। একটা বালকের ভিতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগাইয়া দিতে হইবে—এইমাত্র শিক্ষকের কাজ।

শিক্ষার মূলতত্ত্ব

কঠোপনিষদের সেই মহাবাক্যটি মনে পড়িতেছে—'শ্রদ্ধা' বা অদ্ভুত বিশ্বাস। নচিকেতার জীবনে শ্রদ্ধার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'শ্রদ্ধা' বা যথার্থ বিশ্বাস-তত্ত্ব প্রচার করাই আমার জীবনব্রত। আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি যে, এই বিশ্বাস সমস্ত মানবজাতির জীবনের এবং সকল ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ, নিজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও। নিজের উপর বিশ্বাস কখনও হারাইও না, জগতে তুমি সব করিতে পার। কখনও নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিও না, সব শক্তি তোমার ভিতরে রহিয়াছে। অতএব উঠ, সাহসী হও, বীর্য্যবান হও। সমুদয় দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে লও—জানিয়া রাখ, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃজনকর্ত্তা। তুমি যে কিছু বল বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এক্ষণে এই জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাক। 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—এক্ষণে সমুদয় অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে।

শিক্ষালাভের উপায়

শিক্ষালাভের মনস্তত্ত্ব

আমরা যদি মনকে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তাহা হইলে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারি না। মন এই বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে—প্রথমে এই স্থূল শরীরে বাহ্যযন্ত্রগুলি অবস্থিত; তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থূল শরীরেই ইন্দ্রিয়গণও অবস্থিত। কিন্তু তথাপি পর্য্যাপ্ত হইল না। মনে কর আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময় এখানে একটা ঘণ্টা বাজিল, তুমি হয়ত সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে না। ঐ শব্দতরঙ্গ তোমার কর্ণে উপনীত হইয়া কর্ণ-পটহে লাগিল, স্নায়ুদ্বারা ঐ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছিল, কিন্তু তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? যদি মস্তিষ্কে সংবাদবহন পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রবণপ্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? তাহা হইলে দেখা গেল, ঐ শ্রবণপ্রক্রিয়ার জন্য আরো কিছুর আবশ্যক—মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত ছিল না। যখন মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক থাকে, ইন্দ্রিয় উহাকে যে কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা গ্রহণ করিবে না। যখন মন উহাতে যুক্ত হয়, তখনই কেবল উহার পক্ষে কোন সংবাদ গ্রহণ সম্ভব। কিন্তু উহাতেও বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। বাহিরের যন্ত্র সংবাদ বহন করিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে উহা বহন করিতে পারে, মন

এমন কি মুচি যদি বেশী একাগ্রতাসহকারে কাজ করে, তবে সে আরও ভালরূপে জুতায় কালি দিতে পারিবে; পাচকের একাগ্রতা থাকিলে সে আরও ভাল খাদ্য প্রস্তুত করিবে। অর্থোপার্জ্জনে, দেব-আরাধনে বা অন্য যে কোন বিষয়ে, যেখানেই এই একাগ্রতা-শক্তি যত বেশী সেইখানেই উহা তত বেশী সুসম্পন্ন হইবে। মনের একাগ্রতাশক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এই সকল জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে; প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে, প্রকৃতি তাঁহার রহস্য উদঘাটিত করিয়া দেন এবং সেই আঘাতের শক্তি ও তেজ একাগ্রতা হইতেই আসে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; ইহা যতই একাগ্র হয়, ততই সেই শক্তি এক লক্ষ্যের উপর আসে এবং ইহাই রহস্য। বালক যখন প্রথম পড়ে, সে এক-একটি অক্ষর দুইবার তিনবার করিয়া উচ্চারণ করিয়া তৎপরে শব্দটি উচ্চারণ করে, এ সময়ে তাহার দৃষ্টি এক-একটি অক্ষরের উপরে থাকে। কিন্তু যখন আরও বেশী শিক্ষা করে, তখন আর অক্ষরের উপর নজর না পড়িয়া এক-একটি শব্দের উপর পড়ে এবং অক্ষরের উপলব্ধি না করিয়া একেবারে শব্দের উপলব্ধি করে; যখন আরও অগ্রসর হয়, তখন একেবারে এক-একটি sentence (বাক্য)-এর উপর নজর পড়ে ও তাহারই উপলব্ধি করে; এই উপলব্ধি আরও বাড়াইয়া দিলে একটি পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা উপলব্ধি হয়। কেবল মনঃসংযম-সাধনা। তুমিও চেষ্টা কর, তোমারও হইবে। নিকৃষ্ট মানুষ হইতে সর্ব্বোচ্চ যোগী পর্য্যন্ত সকলকেই জ্ঞানলাভের জন্য এই একই উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়।

বহির্ব্বিজ্ঞানে বাহ্য বিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়—আর অন্তর্ব্বিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখী করিতে হয়। যোগীরা এই একাগ্রতাশক্তির ফল অতি মহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের সমুদয় সত্য—বাহ্য ও আন্তর, উভয় জগতের সত্যই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মন একাগ্রতাসম্পন্ন হইলে এবং ঘুরাইয়া উহার উপর প্রয়োগ করিলে আমাদের ভিতরের সমস্তই আমাদের প্রভু না হইয়া আজ্ঞাবহ দাস হইবে। গ্রীকেরা বহির্জগতের দিকে একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল, ফলে শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে তাহারা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। হিন্দুগণ অন্তর্জগতে—অদৃশ্য আত্মরাজ্যে একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল, ফলে যোগশাস্ত্র উদ্ঘাটিত হয়। প্রত্যেক বৃত্তির এমনভাবে বিকাশসাধন করিতে হইবে যে, যেন উহা ছাড়া আমাদের অন্য কোন বৃত্তিই নাই—ইহাই হইতেছে তথাকথিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতিসাধনের যথার্থ রহস্য। অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে উদারতা অর্জ্জন কর, কিন্তু সেটাকে হারাইয়া নহে। আমরা অনন্তস্বরূপ—আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ইতি করা যায় না। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় এই—মনকে কোন বিষয়বিশেষে প্রয়োগ করা নহে, আসল মনটারই বিকাশ করা ও তাহাকে সংযত করা। তাহা হইলেই তুমি উহাকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারিবে। বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্ম্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—যাহাই কেন ঘটুক না, সে স্থিরতা কখন নষ্ট হইবার নহে—চিত্তের সে সমভাব কখন ভঙ্গ হইবার

নহে। আর আমরা বহুদর্শিতার দ্বারা ইহা জানিয়াছি যে কার্য্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত।

একাগ্রতালাভের উপায়—অভ্যাস

আমরা যতই শান্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল,—আর আমরা অধিক কার্য্য করিতে পারি। যখন আমরা ভাববশে পরিচালিত হইতে থাকি, তখন আমরা শক্তির বিশেষ অপব্যয় করিয়া থাকি, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে বিকৃত করিয়া ফেলি, মনকে চঞ্চল করিয়া তুলি, কিন্তু কার্য্য খুব কম করিতে পারি। যে শক্তি কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা বৃথা ভাবুকতামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া ক্ষয় হইয়া যায়। কেবল যখন মন অতিশয় শান্ত ও স্থির থাকে, তখনই আমাদের সমুদয় শক্তিটুকু সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। আর যদি তোমরা জগতে বড় বড় কার্য্য-কুশল ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ কর, তোমরা দেখিবে, তাঁহারা অদ্ভুত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিছুতেই তাঁহাদের চিত্তের সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিত না। এই জন্যই যে ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা বেশী কাজ করিতে পারে না; আর যে কিছুতেই রাগে না, সে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ঘৃণা বা কোন রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে আপনাকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, এবং সে বড় কাজের লোক হয় না। কেবল শান্ত, ক্ষমাশীল, স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র। মনে কর, আমি

একখানা পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক ঐ পুস্তকাকৃতি বাহিরে নাই। উহা কেবল মনে অবস্থিত। বাহিরের কোন কিছু ঐ আকৃতিটিকে জানাইয়া দেয় মাত্র; বাস্তবিক উহা চিত্তেই আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলি, যাহা তাহাদের সম্মুখে আসিতেছে, তাহাদেরই সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদেরই আকার গ্রহণ করিতেছে। যদি তুমি মনের এইসকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পার, তবে তোমার মন শান্ত হইবে। "তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ" (পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১০) অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরতা হয়। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে, মন এইরূপ নিরন্তর সংযত অবস্থায় থাকিতে পারে, তখন মন নিত্য একাগ্রতা-শক্তি লাভ করে। মন একাগ্র হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না। যতই সময়ের জ্ঞান চলিয়া যায়, আমরা ততই একাগ্র হইতেছি, বুঝিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যখন আমরা খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে মগ্ন হই, তখন সময়ের দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে না; যখন আবার পুস্তকপাঠে বিরত হই, তখন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে, কতখানি সময় অমনি চলিয়া গিয়াছে। সমুদয় সময়টি যেন একত্রিত হইয়া বর্ত্তমানে একীভূত হইবে। এইজন্যই বলা হইয়াছে, যতই অতীত ও ভবিষ্যৎ আসিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়, মন ততই একাগ্র হইয়া থাকে। একাগ্রতার অর্থই এই, শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সময় সংক্ষিপ্ত করা। এক বিষয়ে একাগ্র করিতে পারিলে সেই মন যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, একাগ্র করা যায়।

ব্রহ্মচর্য্য একাগ্রতার সহায়ক ও অসীমশক্তিদাতৃ

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারীকে কায়মনোবাক্যে পবিত্র হইতে হইবে। দ্বাদশবৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যসাধন করিলে শক্তিলাভ হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হইয়া গেল। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য-পালন ঠিক ঠিক করিতে পারিলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হইয়া যায়—শ্রুতিধরত্ব, স্মৃতিধরত্ব হয়। যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে, একপ্রাণে সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারীবাবা ধ্যান জপ, পূজা, পাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটিটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মত দেখাইত। অপবিত্র চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দোষাবহ। কামেচ্ছাকে দমন করিলে তাহা হইতে উচ্চতম ফল লাভ হয়। উহাদিগকে সংযত করিলে তোমার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। সংযম হইতে মহতী ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হইবে; উহা এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করিবে যাহা ইঙ্গিতে জগৎকে পরিচালন করিতে পারে। অজ্ঞ-লোকেরা এই রহস্য জানে না। কামশক্তিকে আধ্যাত্মিকশক্তিতে পরিণত কর। এই শক্তিটা যত প্রবল থাকিবে ইহাদ্বারা তত অধিক কাজ হইতে পারিবে। প্রবল জলের স্রোত পাইলেই তাহার সহায়তায় খনির কার্য্য করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি—মহতী ইচ্ছা-শক্তি সঞ্চিত থাকে। উহা ব্যতীত মানসিক তেজ আর কিছুতেই হইতে পারে না। যত মহা মহা মস্তিষ্কশালী পুরুষ দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই

ব্রহ্মচর্য্যবান ছিলেন। ইহাদ্বারা মানুষের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা লাভ করা যায়। মানবসমাজের নেতাগণ সকলেই ব্রহ্মচর্য্যবান ছিলেন, তাঁহাদের সমুদয় শক্তি এই ব্রহ্মচর্য্য হইতেই লাভ হইয়াছিল। প্রত্যেক বালককে নিখুঁত ব্রহ্মচর্য্য-পালনে অভ্যস্ত করাইতে হইবে; তাহা হইলেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আসিবে। ঠিক ঠিক শ্রদ্ধার ভাব আবার আমাদের ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আমাদের আত্মবিশ্বাস আবার জাগরিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের দেশের সমস্যাসমূহের আমাদের দ্বারা ক্রমশঃ সমাধান হইবে।

অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত; শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে জ্ঞানচর্চ্চায় অধিকতর সুখ পাইয়া থাকে। তখন সে বিষয়-ভোগে তত সুখ পায় না। কুকুর, ব্যাঘ্র খাদ্য পাইলে যেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন করিতে থাকে, কোন মানুষের পক্ষে সেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন সম্ভবপর নহে। আবার মানুষ বুদ্ধিবলে নানাবিষয় জ্ঞাত হইয়া ও নানাকার্য্য সম্পাদন করিয়া যে সুখ অনুভব করে, কুকুরের তাহা কখন স্বপ্নেও অনুভব হয় না। প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে সুখানুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোন পশু উন্নত ভূমিতে আরোহণ করে তখন সে ঐ নিম্নজাতীয় সুখ আর তত আগ্রহের সহিত সম্ভোগ করিতে পারে না। মনুষ্য-সমাজের মধ্যেও দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয় সে ইন্দ্রিয়সুখ ততই তীব্রভাবে অনুভব করে। আর যতই তাহার শিক্ষাদির উন্নতি হয়, ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও এতদ্বিধ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাহার সুখানুভূতি হইতে থাকে। এইখানেই মানুষ ও

পশুর মধ্যে প্রভেদ—মানুষের একাগ্রতাশক্তি বেশী। মানুষে মানুষে প্রভেদও এই একাগ্রতাশক্তির তারতম্যেই হইয়া থাকে। নিম্নতম মানুষের সঙ্গে উচ্চতম মানুষের তুলনা কর, দেখিবে যে প্রভেদ শুধু একাগ্রতার গাঢ়তায়। আমার মনে হয় শিক্ষার সার কথাই হইল মনের একাগ্রতা—কতকগুলি ঘটনার সংগ্রহ নহে।

প্রত্যক্ষ অনুভূতি

প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করিলে তাহা হইতেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়। কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়। আমরা সমগ্র জীবন যদি কেবল বিচার ও তর্ক করিয়া কাটাইয়া দেই, তাহা হইলে আমরা একবিন্দু সত্য লাভ করিতে পারিব না—নিজে প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে কি সত্যলাভ হয়?

যদি সমুদয় জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় যে, আমরা যাহা কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখন কল্পনাও করিতে পারি না অথবা বুঝিতেও পারি না। কুক্কুট-শাবকগণ ডিম্ব হইতে ফুটিবামাত্র খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যখন কুক্কুটী দ্বারা হংসডিম্ব ফুটান হইয়াছে, তখন হংসশাবক ডিম্ব হইতে বাহির হইবামাত্র জলে চলিয়া গিয়াছে; তাহার মাতা মনে করিল, শাবকটা বুঝি জলে ডুবিয়া গেল। যদি প্রত্যক্ষানুভূতিই জ্ঞানের একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে এই কুক্কুটশাবকগুলি কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে শিখিল? অথবা ঐ হংসশাবকগুলি জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান বলিয়া

জানিতে পারিল? যদি তুমি বল, উহা সহজাত-জ্ঞান (instinct) মাত্র, তবে তাহাতে কোন অর্থই বুঝাইল না। সহজাত-জ্ঞান কি? আমাদেরও ত এইরূপ সহজাত-জ্ঞান অনেক রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়া থাকে; তোমাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, যখন তোমরা প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ কর, তখন তোমাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দার, একটির পর আর একটিতে, কত যত্নের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু অনেকদিনের অভ্যাসের পর, এক্ষণে তোমরা হয়ত কোন বন্ধুর সহিত কথা বলিবে অথচ সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোতে যথাযথ হাত চালাইতে পারিবে। উহা এক্ষণে তোমাদের সহজাত-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে—উহা তোমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য কার্য্য যাহা আমরা করিয়া থাকি, তাহার সম্বন্ধেও ঐ। অভ্যাসের দ্বারা উহা সহজাত-জ্ঞানে পরিণত হয়, স্বাভাবিক হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে এই বোধ হয় যে, যাহা পূর্ব্বে বিচার-পূর্ব্বক-জ্ঞান ছিল, তাহাই এক্ষণে নিম্নভাবাপন্ন হইয়া সহজাত-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। এই বিচার আবার প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং সমুদয় সহজাত-জ্ঞানই পূর্ব্ব প্রত্যক্ষানুভূতির ফল। পূর্ব্বানুভূত অনেক ভয়ের সংস্কার কালে এই জীবনের মমতারূপে পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই আপনা-আপনি ভয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার কষ্টের পূর্ব্বসংস্কার রহিয়াছে। যোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে, বলা যায়। শিক্ষা মজ্জাগত

হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলি জ্ঞান-সমষ্টি কখনও নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না। তোমরা জগৎকে কতকগুলি জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে উহার বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই।

মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুর দেখিলাম। উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরূপে? যখনই উহার ছাপ আমার মনের উপর পড়িল, উহার সহিত মনের ভিতরকার পূর্ব্ব-সংস্কারগুলিকে মিলাইতে লাগিলাম; দেখিলাম, তথায় আমার সমুদয় পূর্ব্বসংস্কারগুলি স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত রহিয়াছে। নূতন কোন বিষয় আসিবামাত্রই আমি ঐটিকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত মিলাইলাম। যখনই দেখিলাম, সেইরূপভাবের আর কতকগুলি সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাইলাম—তখনই আমার তৃপ্তি আসিল। আমি তখন উহাকে কুকুর বলিয়া জানিতে পারিলাম, কারণ উহা পূর্ব্বাবস্থিত কতকগুলি সংস্কারের সহিত মিলিল। যখন আমি উহার তুল্য সংস্কার আমার ভিতরে না দেখিতে পাই, তখনই আমার অতৃপ্তি আসে। এইরূপ হইলে উহাকে 'অজ্ঞান' বলে। আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে জ্ঞান বলে। যখন একটি আপেল পড়িল, তখন মানুষের অতৃপ্তি আসিল, তারপর মানুষ ক্রমশঃ ঐরূপ কতকগুলি ঘটনা—যেন একটি শৃঙ্খল দেখিতে পাইল। কি সে শৃঙ্খল? সেই শৃঙ্খল এই যে, সকল আপেলই পড়িয়া থাকে। মানুষ উহার 'মাধ্যাকর্ষণ' সংজ্ঞা দিল। অতএব আমরা দেখিলাম—পূর্ব্বে

কতকগুলি অনুভূতি না থাকিলে নূতন অনুভূতি অসম্ভব। কারণ ঐ নূতন অনুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাওয়া যাইবে না। অতএব দেখিলাম, এই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার ব্যতীত নূতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক কিন্তু আমাদের সকলকেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে। জ্ঞান কেবল ভূয়োদর্শনলব্ধ, জানিবার আর কোন পথ নাই। অতএব মানুষে বা পশুতে যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা অবশ্যই পূর্ব্ববর্ত্তী ইচ্ছাকৃত কার্য্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইবে। আর ইচ্ছাকৃত কার্য্য বলিলেই পূর্ব্বে আমরা অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলাম, স্বীকার করা হইল। পূর্ব্বকৃত কার্য্য হইতে ঐ সংস্কার আসিয়াছিল, আর ঐ সংস্কার এখনও বর্ত্তমান। এই মৃত্যুভীতি, এই জন্মিবামাত্র জলে সন্তরণ আর মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছাকৃত স্বাভাবিক কার্য্য রহিয়াছে, সবই পূর্ব্ব কার্য্য ও পূর্ব্ব অনুভূতির ফল— উহারা এক্ষণে স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে।

যদি আমাকে আবার শিক্ষা নিতে হইত এবং এ বিষয়ে আমার কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে আমি ঘটনাবলী সম্বন্ধে আর অধ্যয়ন করিতাম না। আমি আমার একাগ্রতা ও পৃথগ্‌করণ-শক্তিকে বিকাশ করিব এবং নিখুঁত উপায়ে আমার ইচ্ছামত তথ্যসংগ্রহ করিব।

পরানুকরণ, নবানুকরণ ও আত্মপ্রত্যয়

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য—নিজের নিজের আদর্শ লইয়া তাহা জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা। অপর ব্যক্তির আদর্শ লইয়া তদনুসারে চরিত্রগঠনের চেষ্টা হইতে উন্নতিলাভে কৃতকার্য্য হইবার

ইহা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। অপরের আদর্শ হয়ত তিনি জীবনে কখনই পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন না। কোন সমাজের সকল নরনারী একরূপ মন বা শক্তিবিশিষ্ট নহে, অথবা কোন বিষয় বুঝিবার সকলের একরূপ শক্তি নাই। সুতরাং প্রত্যেকেরই আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন থাকা উচিত; আর এই আদর্শগুলির কোনটিকেই উপহাস করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য যতদূর পারে করুক। আমাকে তোমার বা তোমাকে আমার আদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক নহে। ওক-বৃক্ষের আদর্শে আপেল বা আপেল-বৃক্ষের আদর্শে ওক-বৃক্ষের বিচার করা উচিত নহে। আপেল-বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক-বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের নমুনা লইয়া বিচার করা আবশ্যক। এইরূপ আমাদের সকলের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

আহার, পোশাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে, ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হইয়া যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখিতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাহাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতের সূচনাই হয়। ব্যস্ত হইও না; অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। আমাদিগকে এই একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে—অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি নিজেকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি—তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ কখন সিংহ হয় না। অনুকরণ—হীন, কাপুরুষের ন্যায় অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহা মানবের

ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন। যখন মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে; যখন সে নিজ পূর্ব্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার বিনাশ আসন্ন।

তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাঁহাদের নামে গৌরব অনুভব কর, আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না। তোমাদের ভিতর যাহা আছে, নিজ শক্তিবলে তাহা প্রকাশ কর; কিন্তু অনুকরণ করিও না—অথচ অপরের নিকট যাহা ভাল, তাহা গ্রহণ কর। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে। বীজ মাটিতে পুঁতিলে, উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও জল হইতে রস সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু উহা যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, তখন কি উহা মাটি, জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, উহা তাহা করে না। উহা মৃত্তিকাদি হইতে উহার প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়; তোমরাও এইরূপ কর। অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের যথেষ্ট শিখিবার আছে; যে শিখিতে চায় না, সে ত পূর্ব্বেই মরিয়াছে। আমাদের মনু বলিয়াছেন—

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥" (২।২৩৮)

অর্থাৎ নীচ ব্যক্তির সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতেও যত্নপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা করিবে। হীন চণ্ডালের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, ইত্যাদি।

অপরের নিকট ভাল যাহা পাও, শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না ; এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতি-বিশেষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত। জাতীয় জীবন-স্রোতকে প্রবাহিত হইতে দাও। যে সকল প্রবল অন্তরায় এই বেগশালিনী নদীর স্রোতমার্গ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে সরাইয়া দাও, পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, নদীর খাতকে সবল করিয়া দাও—তাহা হইলে উহা নিজ স্বাভাবিক গতিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইবে—এই জাতি নিজের সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধন করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে ছুটিবে।

আমি সমগ্র জগতে দেখিয়াছি,—দীনতার, দুর্ব্বলতা-সম্পাদক উপদেশের দ্বারা অতি অশুভ ফল ঘটিয়াছে, সমগ্র মনুষ্যজাতিকে উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে এইরূপ-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়—আর তাহারা যে শেষে আধপাগলা-গোছ হইয়া দাঁড়ায়, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? যদি জড় জগতে বড় হইতে চাও, বিশ্বাস কর তুমি বড়। আমি হয়ত একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়ত পর্ব্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও, অনন্ত সমুদ্র আমাদের উভয়েরই পশ্চাদ্দেশে রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্য্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই উহা হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব আপনার উপর বিশ্বাস কর। জগতের ইতিহাসে দেখিবে, কেবল যে সকল

জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রবল ও বীর্য্যবান হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রবল ও বীর্য্যবান হইয়াছে। দৃঢ়চিত্ত হও; সর্ব্বোপরি পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও; বিশ্বাস কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

(১) চরিত্রগঠন

অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ; সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সংস্কারসমষ্টিই চরিত্র—সুখ-দুঃখ তাহার উপাদান

সমুদয় মানবজাতির চরম লক্ষ্য—জ্ঞানলাভ। প্রাচ্যদর্শন আমাদের নিকটে এই একমাত্র লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ লক্ষ্যের কথা বলে নাই। সুখ মানুষের চরম লক্ষ্য নহে—জ্ঞান। সুখ, আনন্দ—এ সকলের ত শেষ আছে। সুখই চরম লক্ষ্য মনে করা মানুষের ভ্রম। জগতে আমরা যত দুঃখ দেখিতে পাই, তাহাদের কারণ—মানুষ অজ্ঞের মত মনে করে সুখই তাহার চরম লক্ষ্য! কালে মানুষ বুঝিতে পারে, সে সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকে ক্রমাগত চলিয়াছে—সুখ-দুঃখ উভয়ই তাহার মহান্ শিক্ষক—সে শুভ হইতে যেমন, অশুভ হইতেও তদ্রূপ শিক্ষা পায়। সুখ-দুঃখ যেমন তাহার আত্মার উপর দিয়া চলিয়া যায়, অমনি তাহারা উহাতে নানাবিধ চিত্র রাখিয়া যায়, আর এ চিত্র বা সংস্কারসমষ্টির ফলকেই আমরা মানব-চরিত্র বলি। কোন ব্যক্তির চরিত্র লইয়া আলোচনা করিয়া দেখ, বুঝিবে—উহা প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের প্রবৃত্তি, মনের প্রবণতাসমূহের সমষ্টি মাত্র। তুমি দেখিবে—তাহার চরিত্রগঠনে সুখ-দুঃখ উভয়ে সমান উপাদান ; তাহার চরিত্রকে এক বিশেষরূপ

ছাঁচে ঢালিবার পক্ষে ভালমন্দ উভয়েরই সমান অংশ আছে; কোন কোন স্থলে বরং দুঃখ সুখ হইতে অধিক শিক্ষা দিয়াছে, দেখা যায়। জগতের মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে দুঃখ সুখ অপেক্ষা তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে; দারিদ্র্য ধন হইতে অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা হইতে নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। যদি আমরা ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরণকে অধ্যয়ন করি, তবে দেখিব আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বর-অভিসম্পাত, নিন্দা-স্তুতি সকলই আমাদের মনের উপর বহির্জগতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত হইতে, আমাদের নিজেদের ভিতর হইতেই উৎপন্ন। উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমান চরিত্র গঠিত। যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্যের দিকে লক্ষ্য করিও না। অবস্থাবিশেষে নিতান্ত নির্বোধও বীরের মত কার্য করিয়া থাকে। লোককে তাহার অতি সামান্য কার্য করিবার সময় লক্ষ্য কর, উহাতেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনা সামান্য লোককে পর্যন্ত মহান্ করিয়া তুলে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই যাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব লক্ষিত হয়, তিনিই প্রকৃত মহান্ লোক। মানুষকে যতপ্রকার শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে কর্মের দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই প্রবলতম শক্তি।

ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমতী

আমরা জগতে যতপ্রকার কার্য্য দেখিতে পাই, মনুষ্য-সমাজে যতপ্রকার গতি হইতেছে, আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল কার্য্য হইতেছে, উহারা কেবল চিন্তার প্রকাশ মাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। যন্ত্রসমূহ, নগর, জাহাজ, যুদ্ধজাহাজ সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাশ মাত্র। এই ইচ্ছা আবার চরিত্র হইতে গঠিত, চরিত্র আবার কর্ম্মগঠিত। যেমন কর্ম্ম, ইচ্ছার প্রকাশও তদনুরূপ। আমাদের দেহ যেন লৌহপিণ্ডের মত, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন তাহার উপর আস্তে আস্তে হাতুড়ির আঘাত—এই ভাবে আমরা দেহটাকে যেভাবে ইচ্ছা, গঠন করি। আমরা এখন যাহা হইয়াছি, তাহা আমাদের চিন্তাগুলিরই ফলস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিও। বাক্য ত গৌণ জিনিস। চিন্তাগুলিই বহুকালস্থায়ী, আর তাহাদের গতিও বহুদূরপ্রসারী। আমরা যে কোন চিন্তা করি, তাহাতে আমাদের চরিত্রের ছাপ লাগিয়া যায়; এই হেতু সাধুপুরুষদের উপহাসে বা ভর্ৎসনায় পর্য্যন্ত তাহাদের হৃদয়ের ভালবাসা ও পবিত্রতার একটুখানি রহিয়া যায় এবং তাহাতে আমাদের কল্যাণসাধনই করে।

আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্ব্বল। আমাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে? আমরা আপনারাই আপনাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছি। আমরা নিজের চক্ষে নিজেই হাত দিয়া অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, তাহা হইলে দেখিবে সেই জীবাত্মার স্বপ্রকাশ স্বরূপের আলোক রহিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন

তাহা কি দেখিতেছ না? এই সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি?—বাসনা। কোন পশু যেভাবে অবস্থিত সে তদতিরিক্ত অন্য কিছুরূপে থাকিতে চায়—সে দেখে, সে যে-সকল অবস্থার মধ্যে বাস করে, সেগুলি তাহার উপযুক্ত নহে—সুতরাং সে একটি নূতন শরীর গঠন করিয়া লয়। তুমি সর্ব্বনিম্নতম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তি মূলে উৎপন্ন হইয়াছ—আবার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরও উন্নত হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমতী। তুমি বলিতে পার, যদি ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমতী হয়, তবে আমি অনেক কাজ—যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি না কেন? তুমি যখন একথা বল, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র 'আমি'র দিকে লক্ষ্য করিতেছ মাত্র। ভাবিয়া দেখ, তুমি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার আপন ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইহা সর্ব্বশক্তিমতী? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও অধিক উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন—চরিত্র, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা—উহার দুর্ব্বলতা নহে। যদি তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া বাড়ী গিয়া অনুতাপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাও তাহাতে বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উহা তোমাকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকারময় থাকে, আর তুমি সেই গৃহে আসিয়া 'হায়, বড় অন্ধকার! বড় অন্ধকার!' বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে? একটি দিয়াশলাই জ্বালিলেই এক মুহূর্ত্তে গৃহ আলোকিত হইবে। অতএব সারাজীবন 'আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অন্যায় কাজ করিয়াছি'

বলিয়া চিন্তা করিলে তোমার কি উপকার হইবে? আমরা নানা দোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। জ্ঞানের আলো জ্বাল, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রকৃত 'আমি'কে—সেই জ্যোতির্ম্ময়, উজ্জ্বল, নিত্য-শুদ্ধ 'আমি'কে প্রকাশ কর—প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর।

সংস্কার চরিত্রের নিয়ামক

মনকে যদি একটি হ্রদের সহিত তুলনা করা যায়, তবে বলা যায় যে, মনের মধ্যে যে-কোন তরঙ্গ উঠে, তাহার বিরাম হইলেও তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, কিন্তু উহা চিত্তের ভিতর একটি দাগ এবং সেই তরঙ্গটির পুনঃ উদয় হইবার সম্ভাবনীয়তা রাখিয়া যায়। এই দাগ এবং ঐ তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনীয়তার একত্রে নাম—সংস্কার। আমরা যে-কোন কার্য্য করি—আমাদের প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালন, আমাদের মনের প্রত্যেক চিন্তা, চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার ফেলিয়া যাইতেছে; আর যখন তাহারা উপরিভাগে প্রকাশিত না থাকে, তখনও তাহারা এত প্রবল থাকে যে, তলে তলে অজ্ঞাতভাবে কার্য্য করিতে থাকে। এই চিত্ত সদা সর্ব্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি উহাদিগকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছে। আমরা প্রতিমুহূর্তে যাহা, তাহা আমাদের মনের উপর এই সংস্কার-পুঞ্জের দ্বারা নিয়মিত। আমি এই মুহূর্তে যাহা, তাহা আমার ভূত জীবনের এই সকল সংস্কার-সমষ্টি মাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে চরিত্র বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কার-সমষ্টি দ্বারা নিয়মিত।

যদি শুভ-সংস্কার প্রবল হয়, সেই চরিত্র সাধুচরিত্ররূপে পরিণত হয়, অসৎ-সংস্কার প্রবল হইলে তাহা অসচ্চরিত্র হয়। যদি কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা মন্দ কথা শুনে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ করে, তাহার মন এই সকল মন্দ-সংস্কারপূর্ণ হইয়া যাইবে এবং উহারাই অজ্ঞাতভাবে তাহার কার্য্য-প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিবে। এইরূপ, যদি কোন লোক ভাল বিষয় ভাবে এবং ভাল কাজ করে, উহাদের সংস্কারগুলি ভালই হইবে এবং উহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহাকে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে। যখন মানুষ এত ভাল কাজ করে এবং এত সৎচিন্তা করে যে, তাহার প্রকৃতিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনিবার্য্য-রূপে সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছা উপস্থিত হয়, তখন সে কোন অন্যায় কার্য্য করিব বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেও, এই সকল সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ তাহার মন তাহাকে উহা করিতে দিবে না—সংস্কার-গুলিই তাহাকে মন্দ দিক হইতে ফিরাইয়া আনিবে। সে তখন তাহার সৎসংস্কারের হস্তে পুত্তলিকাপ্রায়। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়াকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে। যখন এইরূপ হয়, তখনই সেই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায়।

যেমন কূর্ম্ম তাহার পদ ও মস্তক খোলার ভিতরে গুটাইয়া রাখে—তুমি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পার, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু তাহারা বাহিরে আসিবে না—যে ব্যক্তির বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রগুলির উপর সংযমলাভ হইয়াছে, তাহার চরিত্রও সেইরূপ। সর্ব্বদা সৎচিন্তার প্রতিক্রিয়াদ্বারা শুভ সংস্কারগুলি তাহার মনের উপরিভাগে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে বলিয়া চিত্তের শুভ সংস্কার প্রবল হয়; তাহার ফল এই হয় যে, আমরা ইন্দ্রিয় (কর্ম্মেন্দ্রিয় ও

জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই) জয় করিতে সমর্থ হই। তখনই চরিত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই কেবল তুমি সত্য লাভ করিতে পার। এরূপ লোকই চিরকালের জন্য নিরাপদ ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়। তাহার দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য সম্ভবে না। তাহাকে যেখানেই ফেলিয়া দাও না কেন, যে সঙ্গেই তাহাকে রাখ না কেন, তাহার পক্ষে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।

আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে। এইরূপ অবস্থামূলক বা অস্থিরতাবিধায়ক শিক্ষা কিংবা যে শিক্ষা কেবল 'নেতি'-ভাবই প্রবর্ত্তিত করায় সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। মস্তিষ্কের মধ্যে নানা বিষয়ের বহু বহু তথ্য বোঝাই করিয়া, সেগুলিকে অপরিণত অবস্থায় সেখানে সারাজীবন হট্টগোল বাধাইতে দেওয়াকেই শিক্ষা-লাভ করা বলা চলে না। সৎ আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমনভাবে সুপরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠন করিতে পারে। পাঁচটি সংভাবকে যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে যিনি কেবল একটি পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা তোমার শিক্ষা অনেক বেশী। শিক্ষাটি সংস্কারে পরিণত হইয়া ধমনীগত হইলে তবে তাহাকে শিক্ষা বলে (Education is the nervous association of certain ideas). অগ্নির দাহিকা শক্তি যতক্ষণ আমরা উপলব্ধি না করি, ঐ জ্ঞান যতক্ষণ না আমাদের ধমনী ও মজ্জা-গত হয়, ততক্ষণ আগুনের জ্ঞান জন্মায় না। ন্যায় বিজ্ঞান কতকগুলি মুখস্থ করিলেই

শিক্ষা হয় না। যাহা জীবনের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহাই যথার্থ শিক্ষা। পরমহংসদেবের যেমন কাঞ্চনত্যাগ—নিদ্রাবস্থায়ও তাঁর অঙ্গে কাঞ্চন স্পর্শ করাইলে অঙ্গের বিকৃতি উপস্থিত হইত। এই-প্রকার সংস্কারগত যাহা হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।

এইরূপে আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে-কোন কার্য্য আমরা করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে অবস্থিত আছে। যে চিন্তাগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই স্মৃতি বলে। সবগুলিই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্ত্তমান থাকে। বেদান্তবাদীদের মতে—যখন এই শরীরের পতন হয়, তখন মানবের ইন্দ্রিয়গণ মনে লয়প্রাপ্ত হয়, মন প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীররূপ বসন পরিধান করিয়া যান। এই সূক্ষ্ম শরীরেই মানুষের সমুদয় সংস্কার বাস করে।

পূর্ব্বসংস্কারগুলিই কেবল আমাদিগের একাগ্রতালাভের প্রতিবন্ধক। তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ যে, যখনই তোমরা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, তখনই তোমাদের নানাপ্রকার চিন্তা আসে। অন্য সময়ে তাহারা তত প্রবল থাকে না, কিন্তু যখনই উহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা কর, তখনই উহারা নিশ্চয় আসিবে; তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়া ফেলিবে। ইহার কারণ কি? এই একাগ্রতা-অভ্যাসের সময়েই ইহারা এত প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি যখন উহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছ, তখনই উহারা উহাদের সমুদয় বল প্রকাশ করে।

অন্যান্য সময়ে উহারা ওরূপভাবে বলপ্রকাশ করে না। চিত্তের কোন স্থানে উহারা জড় হইয়া রহিয়াছে, আর ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ-প্রদান করিয়া আক্রমণের জন্য যেন সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছে। ঐগুলিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে ভাবটি হৃদয়ে রাখিতে ইচ্ছা করি, কেবল সেইটিই আসে, অপরাপর সমুদয় ভাবগুলি চলিয়া যায়। তাহা না হইয়া তাহারা ঐ সময়েই আসিবার চেষ্টা করিতেছে। সংস্কারসমূহের এইরূপ মনের একাগ্রতা-শক্তিকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে।

সৎ ও অসৎ অভ্যাস

প্রত্যেক কার্য্যেই যেন চিত্ত-হ্রদের উপর একটি তরঙ্গ চলিয়া যায়। এই কম্পন কালে নষ্ট হইয়া যায়। থাকে কি? এই সংস্কারসমূহই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ অনেকগুলি সংস্কার মনে পড়িয়া থাকিলে তাহারা সমবেত হইয়া অভ্যাসরূপে পরিণত হয়। 'অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব'—এইরূপ কথিত হইয়া থাকে; শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নহে, উহা 'প্রথম' স্বভাবও বটে—মানুষের সমুদয় স্বভাবই ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন যেরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট রহিয়াছি, তাহা পূর্ব্ব অভ্যাসের ফল। সমুদয়ই অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে আমাদের মনে সান্ত্বনা আসে; কারণ, যদি আমাদের বর্ত্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাস বশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ইচ্ছা করিলে যখন ইচ্ছা ঐ অভ্যাসকে নাশ করিতেও পারি। এই সমুদয় সংস্কারই আমাদের মনের ভিতর যে চিন্তা-প্রবাহ চলিয়া যায়, তাহার পশ্চাদবশিষ্ট ফলস্বরূপ। আমাদের চরিত্র এই সমুদয় সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপ। যখন কোন

বিশেষ বৃত্তি-প্রবাহ প্রবল হয়, তখন লোকের সেই ভাব হইয়া দাঁড়ায়। যখন সদ্‌গুণ প্রবল হয়, তখন মানুষ সৎ হইয়া যায়। যদি মন্দভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ মন্দ হইয়া যায়। যদি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে। অসৎ স্বভাবের একমাত্র প্রতিকার—তাহার বিপরীত অভ্যাস। যত কিছু অসৎ অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা কেবল সৎ-অভ্যাসের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। কেবল সৎকার্য্য করিয়া যাও, সর্ব্বদা পবিত্র চিন্তা কর; অসৎ-সংস্কার নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কখনও কাহাকে আশা নাই বলিও না; কারণ অসৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকার চরিত্র, যাহা কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, তাহারই পরিচয় দিতেছে এবং উহা আবার নূতন ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসই স্বভাবকে সংশোধিত করিতে পারে। যে-কোন কার্য্য ভগবানের দিকে লইয়া যায় তাহাই সৎকার্য্য, আর যে-কোন কার্য্য আমাদিগকে নিম্নদিকে লইয়া যায় তাহা অসৎ কার্য্য। ভিতরের দিক হইতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি কার্য্য আমাদিগকে উন্নতিপ্রবণ করে, আর কতকগুলি কার্য্যের প্রভাবে আমরা অবনত ও পশুভাবাপন্ন হইয়া যাই।

চরিত্রবলে মানুষ সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারে। পাশ্চাত্যজাতিগণ জাতীয়-জীবনের যে অপূর্ব্ব প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভসমূহ-অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত—যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এ-জাতি

বা ও-জাতির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছুই হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে। শত শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়, আর নিষ্কলুষ চরিত্রের মত অন্য কোন্ শক্তি মানুষকে যথার্থ যোগ্যতাদানে সমর্থ? সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহারাই মাত্র জয়লাভ করিবে যাহারা জীবনে চরিত্রের চরম উৎকর্ষ দেখাইতে পারিবে।

(২) মানুষ তৈয়ার করা

অতীত ভারতের কর্ম্মকুশলতা

ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, ভারত বরাবরই কার্য্যকুশল। আজকাল আমরা শিক্ষা পাইয়া থাকি—আমরা হীনবীর্য্য ও নিষ্কর্ম্মা; যে-সকল ব্যক্তির নিকট এই শিক্ষা পাওয়া যায়, তাঁহাদের নিকট আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি। তাঁহাদের শিক্ষায় এই ফল ফলিয়াছে যে অন্যান্য দেশের লোকের নিকট আমরা হীনবীর্য্য ও নিষ্কর্ম্মা—ইহা একটি কিংবদন্তীস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। ভারত যে কোনকালে নিষ্ক্রিয় ছিল, একথা আমি কোনমতেই স্বীকার করি না। আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমি যেমন কর্ম্মপরায়ণ, অন্য কোন স্থানই সেইরূপ নহে। তাহার প্রমাণ—এই অতি প্রাচীন মহান জাতি এখনও জীবিত রহিয়াছে।

আমাদের এখন এমন ধর্ম্ম চাই, যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদের আবশ্যক—যাহা আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও স্নায়ু-সম্পন্ন হওয়া;—এমন দৃঢ়-ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন হওয়া যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়—যেন উহা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়, যদিও এই কার্য্য-সাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদিও সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়! ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক।

কুসংস্কার পরিহার করিয়া সবল হও

আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল। প্রথমতঃ আমাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য—এই শারীরিক দৌর্ব্বল্য আমাদের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কার্য্য করিতে পারি না; আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না; আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি না; আমরা ঘোর স্বার্থপর; আমরা তিনজন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা—আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি—শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই লইয়া বিবাদ করিতেছি যে, তিলকধারণ এইভাবে করিতে হইবে, কি ঐ ভাবে? অমুক ব্যক্তিকে দেখিলে আমার খাওয়া নষ্ট হইবে কিনা? যাহারা সারা জীবন এইরূপ দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় ও ঐ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন লিখিতে ব্যস্ত, তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করিতে পারা যায়? আমাদের ধর্ম্মটা যে রান্নাঘরে ঢুকিয়া সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে—এইরূপ আশঙ্কা বিলক্ষণ রহিয়াছে। এই অবস্থায় মৌলিকতত্ত্ব-গবেষণায় মানুষ একেবারে অসমর্থ হয়, নিজের সমুদয় তেজ, কার্য্যকরী শক্তি ও চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে; আর যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রতম গণ্ডীর মধ্যেই তাহার কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়, তাহার বাহিরে আর যাইতে পারে না। বরং তোমাদের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নির্ব্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা

আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায়; মৃত্যুকীট সেই জীবন্ত শরীরে প্রবেশ করে। এই দুইটিই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবকবন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্ব্বক একথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, জুতা কোন্‌খানে পায়ে লাগিতেছে। আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইবে, যখন তোমরা আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া জানিবে, তখনই তোমরা উপনিষদ ও আত্মার মহিমা ভাল করিয়া বুঝিবে। নির্ভীক সাহসী লোক—ইহাই আমরা চাই; আমরা চাই রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্কের নির্ব্বীর্য্যতা-সম্পাদক দৌর্ব্বল্যজনক ভাবের দরকার নাই। সেইগুলি পরিত্যাগ কর। সর্ব্বপ্রকার গুপ্তভাবের দিকে ঝোঁক পরিত্যাগ কর। গুপ্তভাব লইয়া নাড়াচাড়া ও কুসংস্কার সর্ব্বদাই দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ, উহা সর্ব্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর চিহ্নস্বরূপ। অতএব উহা হইতে সাবধান হও; তেজস্বী হও, নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াও।

ভিতরে অদম্য শক্তি রহিয়াছে। শুধু 'আমি কিছু নই' ভাবিয়া ভাবিয়া বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছ। তুমি কেন?—সমস্ত জাতিটাই হইয়া পড়িয়াছে। একবার বাহিরে বেড়াইয়া আস, দেখিবে ভারতেতর দেশে লোকের জীবনপ্রবাহ কেমন তর্‌তর্ করিয়া প্রবল বেগে বহিয়া যাইতেছে। আর তোমরা কি করিতেছ? সারাজীবন কেবল বাজে বকিতেছ। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হইয়া ভীমরতি ধরিয়াছে! তোমরা দেশ ছাড়িয়া বাহিরে গেলে তোমাদের জাতি যায়!! এই হাজার বৎসরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়া বসিয়া আছ, হাজার বৎসর ধরিয়া খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিয়া শক্তিক্ষয় করিতেছ! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাইতেছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন করিতেছই বা কি? তোমরা বই হাতে করিয়া সমুদ্রের ধারে পায়চারি করিতেছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণা মাত্র—তাহাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াইতেছ, আর তোমাদের প্রাণ-মন সেই ৩০৲ টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়িয়া রহিয়াছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকীল হইবার মতলব করিতেছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা! আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে পাশে একপাল ছেলে—তার বংশধরগণ—'বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও' বলিয়া উচ্চ চীৎকার তুলিতেছে!! বলি, সমুদ্রে কি

জলের অভাব হইয়াছে যে তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবাইয়া ফেলিতে পারে না? এখন মানুষ হও! নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া দেখ, সবজাতি কেমন উন্নতির পথে চলিয়াছে! আর তোমরা কি করিতেছ? এত বিদ্যা শিখিয়া পরের দরজায় ভিখারীর মত 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' বলিয়া চেঁচাইতেছ। জুতার ঘা খাইয়া, দাসত্ব করিয়া করিয়া তোমরা কি আর মানুষ আছ? তোমাদের মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। এমন সুজলা সুফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশ অপেক্ষা কোটিগুণে ধনধান্য প্রসব করিতেছেন, সেখানে দেহধারণ করিয়া তোমাদের পেটে অন্ন নাই—পিঠে বস্ত্র নাই! যে দেশের ধনধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোমাদের এমন দুর্দ্দশা? ঘৃণিত কুক্কুর অপেক্ষাও যে তোমাদের দুর্দ্দশা হইয়াছে! তোমরা আবার তোমাদের বেদবেদান্তের বড়াই কর! যে জাতি সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হইয়া জীবনধারণ করে, সে জাতির আবার বড়াই! ধর্ম্মকর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসাইয়া আগে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হও। ভারতে কত জিনিস জন্মায়! বিদেশীলোক সেই কাঁচা মাল দিয়া তাহার সাহায্যে সোনা ফলাইতেছে। আর তোমরা ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় তাহাদের মাল টানিয়া মরিতেছ! ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়,' দেশ-বিদেশের লোক তাহা নিয়া তাহার উপর বুদ্ধি খরচ করিয়া নানা জিনিস তৈয়ার করিয়া বড় হইয়া গেল, আর তোমরা তোমাদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরিয়া

রাখিয়া ঘরের ধন পরকে বিলাইয়া দিয়া 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া বেড়াইতেছ।

উপায় তোমাদের হাতেই রহিয়াছে। চোখে কাপড় বাঁধিয়া বলিতেছ, 'আমি অন্ধ, কিছুই দেখিতে পাই না!' চোখের বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেল, দেখিবে—মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণে জগৎ আলো হইয়া রহিয়াছে। টাকা না জোটে ত জাহাজের খালাসী হইয়া বিদেশে চলিয়া যাও। দেশী কাপড়, গামছা, কুলা, ঝাঁটা মাথায় করিয়া আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফেরি কর গিয়া, দেখিবে ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর! আমেরিকায় দেখিলাম—হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফেরি করিয়া করিয়া ধনবান হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অপেক্ষাও কি তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখ না—এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়া আমেরিকায় চলিয়া যাও। সে দেশে ঐ কাপড়ে গাউন তৈয়ার করিয়া বিক্রী করিতে লাগিয়া যাও, দেখিবে কত টাকা আসে।

বহির্বিজ্ঞান ও সংঘবদ্ধতা

সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দলগঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপে অল্প চেষ্টায় অধিক ফললাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। তোমাদের জাতির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ।

যাহাদের দেশের ইতিহাস নাই, তাহাদের কিছুই নাই। তুমি মনে কর না, যাহার 'আমি এত বড় বংশের ছেলে' বলিয়া একটা বিশ্বাস ও গর্ব্ব থাকে, সে কি কখন মন্দ হইতে পারে? কেমন করিয়া হইবে, বল না? তাহার সেই বিশ্বাসটা তাহাকে এমন রাশ টানিয়া রাখিবে যে, সে মরিয়া গেলেও একটা মন্দ কাজ করিতে পারিবে না। তেমনি একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতিটাকে রাশ টানিয়া রাখে, নীচ হইতে দেয় না। তোমাদের দেশের ইতিহাস যেমন থাকা দরকার হইয়াছিল, তেমনই আছে। যাহাদের চক্ষু আছে, তাহারাই সেই জ্বলন্ত ইতিহাসের বলে এখনও সজীব আছে। আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। যতই আমি অতীতকালের আলোচনা করিয়াছি, যতই আমি অধিক পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়াছি, ততই আমার হৃদয়ে এই গৌরব-বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাতেই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহস আসিয়াছে, আমাকে পৃথিবীর ধূলি হইতে উত্থিত করিয়া, আমাদের মহান্ পূর্ব্বপুরুষগণের মহান্ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আর্য্যদিগের সন্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদেরও সেই গর্ব্ব হৃদয়ে আবির্ভূত হউক, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপর সেই বিশ্বাস তোমাদের শোণিতের সহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যাউক, উহা দ্বারা সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধিত হউক। তোমরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়িয়া আছ। তোমাদের hypnotise (মন্ত্রমুগ্ধ) করিয়া ফেলিয়াছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে তোমাদের অপরে বলিয়াছে, তোমরা হীন, তোমাদের কোন

শক্তি নাই, তোমরাও তাহা শুনিয়া আজ হাজার বৎসর হইতে চলিল, ভাবিতেছ—আমরা হীন, সকল বিষয়ে অকর্ম্মণ্য!—ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাই হইয়া পড়িয়াছ। এই দেহও ত তোমাদের দেশের মাটি হইতেই জন্মিয়াছে—আমি কিন্তু কখনও এইরূপ ভাবি নাই। তাই, দেখনা, তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়, যাহারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তাহারাই আমাকে দেবতার মত খাতির করিয়াছে এবং করিতেছে। তোমরাও যদি ঐরূপ ভাবিতে পার যে, 'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে' এবং অন্তরের ঐ শক্তি জাগাইতে পার ত তোমরাও আমার মত হইতে পারিবে। চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। "তদা কুরু পৌরুষম্।"

শরীর ও মন

Brain (মস্তিষ্ক) ও muscles (মাংসপেশীসমূহ) সমানভাবে develop (পূর্ণাবয়বসম্পন্ন) হওয়া চাই। Iron nerves with a well-intelligent brain and the whole world is at your feet (লৌহের মত শক্ত স্নায়ুর সহিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা থাকিলে জগতকে পদানত করা যায়)। আমি চাই এমন লোক—যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্ম্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটা মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য্য, ব্রহ্মতেজ!

মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্তা, উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, ঐগুলি

দিবারাত্র মনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাখ, তাহা হইলে উহা হইতেই মহৎ মহৎ কার্য্য হইবে। অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিও না, কিন্তু মনকে বল, আমরা শুদ্ধ পবিত্র-স্বরূপ। আমরা [illegible] মরা জন্মিয়াছি, আমরা মরিব—এই চিন্তায় আমরা আপনাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি এবং তজ্জন্য সর্ব্বদাই একরূপ ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছি।

'যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ'

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্যক্তি দিবারাত্র নিজেকে হীন ভাবে, তাহার দ্বারা ভাল কিছু হইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি দিবারাত্র নিজেকে দীনদুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই হইয়া যায়। যদি তুমি বল —'আমার মধ্যেও শক্তি আছে,' তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে। আর যদি তুমি বল আমি কিছুই নই, ভাব যে তুমি কিছু নহ, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাক যে তুমি কিছুই নহ, তবে তুমিও 'কিছু না' হইয়া দাঁড়াইবে। এই মহান্ তত্ত্বটি তোমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। আমরা 'কিছুই না' কিরূপে হইতে পারি? আমরা সব করিতে প্রস্তুত, সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব করিতেই হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বাস ছিল, এই আত্মবিশ্বাসরূপ প্রেরণাশক্তিই তাঁহাদিগকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে অগ্রসর করাইয়াছিল; আর যদি এখন অবনতি হইয়া থাকে, যদি আমাদের ভিতর দোষ আসিয়া থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, যেদিন আমাদের দেশের লোক এই আত্মপ্রত্যয়

হারাইয়াছে, সেইদিন হইতেই এই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। দীনহীন ভাবকে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় কর—সব মঙ্গল হইবে। নাস্তিভাবদ্যোতক কিছু থাকিবে না—সবই অস্তিভাবদ্যোতক হওয়া চাই। বল—আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, আর সমুদয় আমার মধ্যে আছে। আমার যাহা কিছু প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান সমুদয়ই আমি আমার ভিতর হইতে অভিব্যক্ত করিব। সংকল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের শরীর হইতে যেন একপ্রকার তেজ নির্গত হইতে থাকে আর তাহার নিজের মন যে অবস্থায় অবস্থিত অপর ব্যক্তির মনে ঠিক সেই ভাবের উৎপাদন করে—এইরূপ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ-সমূহের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হইয়া থাকে। আর যখনই একজন শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিতে অনেকের ভিতর সেই একই প্রকার ভাবের উদয় হয়, তখনই আমরা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠি। সংহতিই শক্তির মূল। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি, শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তি-সমূহের একত্র মিলন। আর এখনই আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে ঋগ্বেদ সংহিতার সেই অপূর্ব্ব শ্লোক প্রতিভাত হইতেছে—

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে ইত্যাদি। (১০।১৯১।২)

তোমরা সকলে সমান-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ পূর্ব্বকালে দেবগণ একমনা হইয়াই তাঁহাদের ভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবগণ একচিত্ত বলিয়াই মানবের উপাসনার যোগ্য হইয়াছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দোষ ও তন্নিরাকরণের উপায়

বর্ত্তমান শিক্ষা — নেতিভাবপূর্ণ

তোমরা এক্ষণে যে শিক্ষালাভ করিতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু উহার আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে, গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। প্রথমতঃ এই শিক্ষায় মানুষ তৈয়ার হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তি-ভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্য যে কোন শিক্ষায় সব কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেয়, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ; দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্য্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা! ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। আর ইহার ফল এই হইয়াছে যে, এইরূপ পঞ্চাশ বৎসরের শিক্ষায় ভারতের তিন প্রেসিডেন্সির[১] ভিতরে একটা প্রকৃত মানুষও জন্মাইল না। মৌলিকতাপূর্ণ যে কেহ এখানে জন্মাইয়াছে, সে এ দেশের নয়, অন্যত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে অথবা তাহারা আপনাদিগকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য পবিত্র শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে। মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া সারা জীবন হজম হইল না—অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

১ বাংলা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ—তখন মাত্র এই তিন প্রেসিডেন্সি ছিল।

ইহাকে শিক্ষা বলে না। বাল্যকাল হইতে বরাবর আমরা একমাত্র নাস্তিভাবপূর্ণ শিক্ষাই পাইয়াছি। আমরা একমাত্র শিখিয়াছি যে, আমরা কেহ নহি। আমাদের দেশে যে মহৎলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা আমাদিগকে অতি অল্পই বুঝিতে দেওয়া হয়। অস্তিভাবপূর্ণ কিছুই আমাদিগকে শিখান হয় না। এমন কি আমাদের হাত, পা কিভাবে ব্যবহার করিতে হয় তাহাও আমরা জানি না।

— শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-বর্জ্জিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষার প্রায় সবটাই দোষযুক্ত, কেবল চূড়ান্ত কেরানিগড়া কল বইত নয়। কেবল তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। মানুষগুলি একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-বর্জ্জিত হইতেছে; গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলে, বেদকে চাষার গান বলে। ভারতের বাহিরে যাহা কিছু আছে, তার নাড়িনক্ষত্রের খবর আছে, নিজের কিন্তু সাতপুরুষ চুলায় যাক্—তিন পুরুষের নামও জানে না। আমরা কেবল দুর্ব্বলতাই আয়ত্ত করিয়াছি। তাইত বলিতেছি, তোমাদের শ্রদ্ধা নাই, আত্মপ্রত্যয়ও নাই। কি হইবে তোমাদের? না হইবে সংসার, না হইবে ধর্ম্ম। হয় ঐ প্রকার উৎসাহ উদ্যম করিয়া সংসারে গণ্যমান্য হও—নয়ত সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া আমাদের পথে আস। দেশ-বিদেশের লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাদের উপকার কর। তবে ত আমাদের মত ভিক্ষা মিলিবে। আদান-প্রদান না থাকিলে কেহই কাহারও দিকে চায় না। দেখিতেছ আমরা দুটা ধর্ম্মকথা শুনাই—তাই গৃহস্থেরা আমাদের দুমুটো অন্ন দেয়। তোমরা কিছুই করিবে না, তোমাদের লোকে অন্ন দিবে

কেন? চাকরিতে, গোলামিতে এত দুঃখ দেখিয়াও তোমাদের চেতনা আসিতেছে না! কাজেই দুঃখও দূর হইতেছে না। ইহা নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার খেলা!

এখনকার কালে যদি কেহ মুশা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি উদ্ধৃত করে, সে হাস্যাস্পদ হয়; কিন্তু হাক্‌স্‌লি, টিণ্ডল বা ডারউইনের নাম করিলেই লোকে সেকথা একেবারে অকাট্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লয়। 'হাক্‌স্‌লি একথা বলিয়াছেন', অনেকের পক্ষে একথা বলিলেই যথেষ্ট! আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে! আগে ছিল ধর্ম্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার; তবে আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিক ভাব আসিত, আর এই আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কাম ও লোভ আসিতেছে। 'অমুক মহাপুরুষ এই কথা বলিয়াছেন, অতএব ইহা বিশ্বাস কর', ধর্ম্মসকল এইরূপ বলাতে যদি তাহারা উপহাসের যোগ্য হয়, তবে আধুনিকগণ অধিক উপহাসের যোগ্য।

এ দেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড়জোর একজন কি দুইজন শিক্ষা পাইতেছে। যাহারা পাইতেছে তাহারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। কেমনেই বা বেচারী করিবে বল? কলেজ হইতে বাহির হইয়াই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তখন যে কোন রকমে একটা কেরানিগিরি, বড় জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটাইয়া লয়। ঐ হইল শিক্ষার পরিণাম! তাহার পর সংসারভারে উচ্চ কর্ম্ম চিন্তা করিবার তাহাদের আর সময় কোথায়? তাহার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না—পরার্থে সে আবার কি করিবে? আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে,

তাহাও একান্ত অনস্তি (নেতি)-ভাবপূর্ণ (negative)। স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভাঙ্গিয়া নষ্ট হয়—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'; যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে 'শ্রদ্ধা'র লোপ। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানঃ বিনশ্যতি" (গীতা)। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট।

ওদেশে দেখিলাম—যাহারা চাকরি করে, Parliament (জাতীয় মহাসভা)-এ তাহাদের স্থান পিছনে নির্দ্দিষ্ট। যাহারা নিজেদের উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বনামধন্য হইয়াছে, তাহাদের বসিবার জন্যই সামনের আসনগুলি নির্দ্দিষ্ট। ওসব দেশে জাতি-ফাতির উৎপাত নাই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁহাদের প্রতি প্রসন্না, তাঁহারাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলিয়া গণ্য হন। আর তোমাদের দেশে জাতির বড়াই করিয়া করিয়া তোমাদের অন্ন পর্য্যন্ত জুটিতেছে না।

প্রয়োজন— (১) আত্মনির্ভরশীল ও জীবনসমস্যা-সমাধানকারী শিক্ষার

কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করিয়া মাথার ভিতর পুরিয়া পাশ করিয়া ভাবিতেছ, 'আমরা শিক্ষিত'। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! ইহার নাম শিক্ষা!! তোমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরী—এই ত? ইহাতে তোমাদেরই বা কি হইল, আর দেশেরই বা কি হইল? একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমিতে অন্নের জন্য কি

হাহাকার উঠিতেছে! তোমাদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হইবে কি ?—কখনও নয়। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ কর, অন্নের সংস্থান কর—চাকরী গুখোরী করিয়া নহে—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য-নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া। দেশের লোকগুলিকে আগে অন্ন সংস্থান করিবার উপায় শিখাইয়া দাও, তারপর ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাও। কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হইলে, ধর্ম্মকথায় কেহই কান দিবে না।

আমাদিগকে বিভিন্নভাবসমূহকে এমনভাবে আপনার করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র এইভাবে গঠিত করিতে পার, তবে যে ব্যক্তি একখানা সারা লাইব্রেরী মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে। "যথা খরশ্চন্দন-ভারবাহী। ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য॥" চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ যেমন উহার ভারই বুঝিতে পারে, অন্যান্য গুণ বুঝিতে পারে না ইত্যাদি। যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরীগুলিই ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সাধু, অভিধান-সমূহই ত ঋষি।

তোমাদের ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাইতেছে! মানুষকে কেবল বলিতেছে—তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নাই! তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। সেইজন্য বেদবেদান্তের

উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে। সদাচার সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়া ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাইতে হইবে। প্রথমতঃ সকলে যাহাতে কাজের লোক হয় এবং তাহাদের শরীরটা যাহাতে সবল হয় সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ দ্বাদশজন পুরুষসিংহ জগৎ জয় করিবে—কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভেড়ারপালের দ্বারা তাহা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ যত বড়ই হউক না কেন, কোন ব্যক্তিগত আদর্শ শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে।

(২) পরার্থতৎপর ও মানবজীবনের উদ্দেশ্যে সচেতন হওয়া

আমাদের এক্ষণে প্রয়োজন, স্বাধীনভাবে জাতীয় বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর সায়েন্স (বিজ্ঞান) পড়ান, চাই technical education (শিল্প-শিক্ষা), চাই যাহাতে industry (শ্রমশিল্প) বাড়ে। লোকে চাকরি না করিয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা করিতে পারিলেই তোমাদের নিকট শিক্ষিত হইল! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করিতে পারা যায় না, যাহাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহ-সাহসিকতা আনে না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায় সেই হইতেছে শিক্ষা। বর্ত্তমান শিক্ষায় তোমাদের বাহ্যিক হালচাল বদলাইয়া দিতেছে—অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোমাদের অর্থাগমের উপায় হইতেছে না। বেশ সুন্দর কলকব্জা তৈয়ার করিতে

শিখিলেই উচ্চ শিক্ষা হয় না। জীবনের সমস্যার সমাধান করা চাই, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা জানা চাই—যে কথা নিয়া আজকাল সভ্যজগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন, আর যেটার আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতিবৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ। দেশশুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ্, আর পরের রাঙ্‌টা সোনা দেখিতেছে। এইটি হইতেছে আজকালকার শিক্ষার ভেল্‌কি। আমি বলি, দেশের সমস্ত বড় লোক আর শিক্ষিত লোকে যদি একবার করিয়া জাপান বেড়াইয়া আসে ত লোকগুলির চোখ ফুটিবে। সেখানে এখানকার মত বিদ্যার বদ্‌হজম নাই। তাহারা সাহেবদের সব নিয়াছে, কিন্তু তাহারা জাপানীই আছে, সাহেব হয় নাই। তোমাদের দেশে সাহেব হওয়া যে একটা বিষম রোগ দাঁড়াইয়াছে। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর সকল জাতির নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ কর। যাহা কিছু পার আপনার করিয়া লও, যাহা কিছু তোমার কাজে লাগিবে তাহা গ্রহণ কর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—মানুষকে তাহার নিজ বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে দিলে, যদিও অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি হয়, কিন্তু উহা পাকা হইয়া থাকে।

(৩) সনাতন প্রণালী-অবলম্বন

আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে ও যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। প্রত্যেক জিনিসের হাঁ-এর দিকটাই, ইতিবাচক দিকটাই সঞ্চিত থাকে এবং প্রকৃতির এই ইতিবাচক বা অস্তিবাচক—এবং এই হেতু চিত্তগঠনকারী—শক্তি-সমূহের একত্রীকরণদ্বারাই পৃথিবীর নেতিবাচক বা নাস্তিবাচক অংশগুলি বিনষ্ট হইয়া থাকে। **Physical, mental, spiritual** (শরীর, মন ও আত্মাসম্বন্ধীয়) সকল ব্যাপারেই মানুষকে **positive ideas** (গড়িবার ভাবসকল) দিতে হইবে; কিন্তু ঘৃণা করিয়া নহে। পরস্পরকে ঘৃণা করিয়াই তোমাদের অধঃপতন হইয়াছে। এখন কেবল **positive thought** (সবল হইবার ও জীবন গড়িবার ভাব) ছড়াইয়া লোককে তুলিতে হইবে। প্রথমে এইরূপে সমস্ত হিন্দুজাতিকে তুলিতে হইবে—তাহার পর জগৎটাকে তুলিতে হইবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হইবার কারণই এই। তিনি জগতে কাহারও ভাব নষ্ট করেন নাই। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়া, উৎসাহ দিয়া তুলিয়া নিয়াছেন। আমাদেরও তাঁহার পদানুসরণে সকলকে তুলিতে হইবে—জাগাইতে হইবে।

ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি

এই সেই প্রাচীন ভূমি, অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্ব্বেই তত্ত্বজ্ঞান যে স্থানকে নিজ নিজ বাসভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন; এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিক-প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগর-সদৃশ প্রবহমানা স্রোতস্বতীসমূহের তুল্য; যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজি দ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্যনিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে ভারতভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম ঋষিমুনিগণের চরণরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এইখানেই সর্ব্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল; এইখানেই মানবমন নিজস্বরূপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল। এইখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্য্যামী ঈশ্বর এবং জগৎ-প্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম্ম ও দর্শনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ-সকল এইখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার তদ্রূপ তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতি-নীতির বিপর্য্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য্য ও জীবন লইয়া পর্ব্বত হইতেও দৃঢ়তরভাবে

এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি, অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

জাতির মূলভিত্তি—ধর্ম্ম

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যদেশে অনেক ঘুরিয়াছি, জগতের সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে, তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপ, কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও আবার মানসিক উন্নতিবিধান, কাহারও বা অন্য কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড; উহারই উপর আমাদের জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত। এক্ষণে এই ধর্ম্মভাব আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের শিরায় শিরায় প্রাত রক্তবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হইতেছে, উহা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জীবনের জীবনীশক্তিরূপে দাঁড়াইয়াছে। তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া আবার তাহাকে নূতন খাতে প্রধাবিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয় তথাপি এই দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বসূচক ধর্ম্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। স্বল্পতম বাধার পথেই তোমরা কার্য্য করিতে পার; ধর্ম্মই ভারতের পক্ষে এই স্বল্পতম বাধার পথ।

এই ধর্ম্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়। এই কথা বলিলেই যে জটাজূট, দণ্ডকমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তাহা নহে। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তাহাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ এ সকল ত মহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" আধ্যাত্মিকতাই জীবনের অন্যান্য কার্য্যসমূহের ভিত্তি। আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও সবলতাসম্পন্ন মানব, যদি ইচ্ছা করেন, অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন; আর মানুষের ভিতর আধ্যাত্মিক বল না আসিলে, তাহার শারীরিক অভাবগুলি পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক পূরণ হয় না। আধ্যাত্মিক উপকারের পরই হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি সম্বন্ধে সাহায্য করা।

ধর্ম্ম—অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশসাধন

ধর্ম্মই শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস। আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্ম্মসম্বন্ধে মতামতকে ধর্ম্ম বলিতেছি না। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান তাহার প্রকাশ-সাধনকে বলে ধর্ম্ম। যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য্য বুঝায়। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশকাল পাইলে সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হউক বা না হউক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত। মন্দির বা গির্জ্জা, পুস্তক বা প্রতীক, ইহারা ধর্ম্মের শিশুবিদ্যালয় বিশেষ, ইহা

ধর্ম্মপথের শিশুকে উচ্চতর পথে চালিত করিতে সাহস দেয়। ধর্ম্ম মত বা সূত্রে নাই অথবা বুদ্ধিপ্রসূত তর্কবিতর্কেও নাই। ইহাই জীবন, ইহাই হওয়া; ইহা অপরোক্ষানুভূতি। প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম্ম। কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষালাভ হয়। আমরা সারাজীবন তর্কবিচার করিতে পারি, কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে সত্যের কণামাত্রও বুঝিতে পারিব না। কয়েকখানি পুস্তক পড়াইয়া তুমি কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়া তুলিবার আশা করিতে পার না। কেবল একখানি মানচিত্র দেখাইলে কি আমার দেশ দেখিবার কৌতূহল-চরিতার্থ হইবে? নিজে তথায় গিয়া সেই দেশ প্রত্যক্ষ করিলে তবে আমার কৌতূহল মিটিবে। মানচিত্র কেবল দেশটির আরও অধিক জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহার আর কোন মূল্য নাই।

হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর, হাজার বৎসর নিরামিষ খাও—উহাতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানিবে, 'সর্ব্বৈব বৃথা' হইল। সকল উপাসনার সার এই শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব-উপাসনা করে, সে প্রবর্ত্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিবদর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

সত্য বলপ্রদ

কোন বিষয় সত্য কিনা জানিতে হইলে তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এই—উহাতে তোমার শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করিতেছে কিনা,—তখন তাহা বিষবৎ পরিহার কর। উহাতে প্রাণ নাই, উহা কখনও সত্য হইতে পারে না। সত্য বলপ্রদ! সত্যই পবিত্রতাবিধায়ক! সত্যই জ্ঞানস্বরূপ! সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, উহা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেয় এবং তেজ আনয়ন করে। যে কোন উপদেশ দুর্ব্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নরনারী বা বালকবালিকা যখন দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ আমি জানি, সত্যই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই আমাদের বীর্য্যলাভ হইবে না, আর বীর না হইলেও সত্যে যাওয়া যাইবে না। এইজন্যই যে কোন মত, যে কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া ফেলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্ব্বদাই মানুষকে সকল প্রকার বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত অসম্ভব, আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়, আমি সেই প্রণালীগুলিকে পছন্দ করি না। কারণ, মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি বৃথামাত্র।

যাঁহারা ঐগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা আমার

সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ঐগুলি মনুষ্যকে বিকৃত ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে,—এত দুর্ব্বল করে যে, ক্রমশঃ তাহার পক্ষে সত্যলাভ করা ও সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব আমাদের আবশ্যক একমাত্র বল বা শক্তি। শক্তিসঞ্চারই এই ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। দরিদ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিসঞ্চারই তাহাদের একমাত্র ঔষধ। মূর্খ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন এই বলই তাহার একমাত্র ঔষধ। আর যখন পাপিগণ অপর পাপিগণ দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখনও ইহাই একমাত্র ঔষধ।

উপনিষৎসমূহ শক্তির আকর

হে বন্ধুগণ, তোমাদের সহিত আমার শোণিতসম্বন্ধে সম্বন্ধ, তোমাদের জীবনমরণে আমার জীবনমরণ। আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্সমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্য্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্ব্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।

উপনিষদের প্রতিপৃষ্ঠা আমাদিগকে তেজবীর্য্যের কথা বলিয়া থাকে। উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী

হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই শব্দ বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'অভীঃ'— ভয়শূন্য হও। —আর আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সুদূর অতীত হইতে সেই পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের চিত্র উদয় হইতেছে —আমি যেন দেখিতেছি সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট সিন্ধুনদের তটে দাঁড়াইয়া অরণ্যবাসী, শিলাখণ্ডোপবিষ্ট সম্পূর্ণ উলঙ্গ, স্থবির, আমাদেরই জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিতেছেন,—সম্রাট সন্ন্যাসীর অপূর্ব্বজ্ঞানে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অর্থ-মানের প্রলোভন দেখাইয়া গ্রীসদেশে আসিতে আহ্বান করিতেছেন। সন্ন্যাসী অর্থ-মানাদি প্রলোভনের কথা শুনিয়া হাস্যসহকারে গ্রীস যাইতে অস্বীকৃত হইলেন; তখন সম্রাট নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।' তখন সন্ন্যাসী উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর কখনও বল নাই। আমায় মারে কে? জড়জগতের সম্রাট, তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না! আমি চৈতন্য-স্বরূপ, অজ ও অক্ষয়! আমি কখন জন্মাই নাই, কখন মরিও না! আমি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ! তুমি বালক, তুমি আমায় মারিবে?' ইহাই প্রকৃত তেজ, ইহাই প্রকৃত বীর্য্য। উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই আমাদের বিশেষভাবে জীবনে পরিণত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

জগতে ইহার ন্যায় অপূর্ব্ব কাব্য আর নাই। তোমাদের উপনিষদ্—সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ, দিব্য দর্শনশাস্ত্র আবার অবলম্বন কর। উপনিষদ্রূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্যসকল অতি সহজবোধ্য—যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহা তদ্রূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে? এই সত্যসকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে পরিণত কর। আমাদিগকে দেখিতে হইবে কিরূপে ইহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে, প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ, যদি ধর্ম্ম মানুষের সর্ব্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কেবল কতকগুলি ব্যক্তির জন্য মতবাদমাত্র।

আত্মতত্ত্ব অবগত হও ; শ্রদ্ধাবান হও

আমাদের এখন কেবল আবশ্যক—আত্মার এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, উহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া। যদি আমার একটি ছেলে থাকিত, তবে সে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমি তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিতাম, 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। তোমরা অবশ্যই পুরাণে (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) রাজ্ঞী মদালসার সেই সুন্দর উপাখ্যান পাঠ করিয়াছ। তাঁহার সন্তান হইবামাত্র তিনি তাহাকে স্বহস্তে দোলায় স্থাপন করিয়া দোল দিতে দিতে তাহার নিকট গাহিতে আরম্ভ করিলেন, 'ত্বমসি

নিরঞ্জনঃ'। এই উপাখ্যানের মধ্যে মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে। তুমি আপনাকে মহান্ বলিয়া উপলব্ধি কর, তুমি মহান্ হইবে। এইরূপে জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে। সকল অসৎকার্য্যের মূল দুর্ব্বলতা। স্বার্থপরতাও এই দুর্ব্বলতা হইতে সঞ্জাত। অপরকে দুঃখ দেওয়ার কারণও এই দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতার জন্যই মানুষ তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। তাহারা কি, তাহারা সকলে জানুক। দিনরাত্রি তাহারা নিজেদের স্বরূপের কথা বলুক। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহারা সকলে 'আমিই সেই' এই ওজোময়ী বাণী পান করুক। তাহার পর তাহারা উহা চিন্তা করুক, আর ঐ চিন্তা, ঐ মনন হইতে এমন সকল কার্য্য হইবে, যাহা জগৎ কখনও দেখে নাই।

প্রাচীন ধর্ম্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম্ম বলিতেছে, যে আপনাতে বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে লইয়া নহে। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ তোমরা সকলে শুদ্ধস্বরূপ। আত্মপ্রীতি অর্থে সর্ব্বভূতে প্রীতি, সকল তীর্য্যগ্‌জাতির উপর প্রীতি, সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি—কারণ 'তুমি' দুইটি নাই। এই মহান্ বিশ্বাসবলেই জগতের উন্নতি হইবে। আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই, মানবজাতির সর্ব্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত কার্য্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগতে যত দুঃখকষ্ট রহিয়াছে, তাহার অনেক হ্রাস হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে সকল শ্রেষ্ঠ নরনারীর মধ্যে যদি কোন ভাববিশেষ

কার্য্যকর হইয়া থাকে, তাহা এই আত্মবিশ্বাস—তাঁহারা এই জ্ঞানে জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইবেন, আর তাহা হইয়াও ছিলেন।

ত্যাগ ও সেবা—জাতীয় আদর্শ

নানাবিধ মত মতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে সত্য, কোন সুর ঠিক তালমানে বাজিতেছে, কোনটি বা বেতালা বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটি প্রধান সুর যেন ভৈরবরাগে সপ্তমে উঠিয়া অপরগুলিকে আর শ্রুতিবিবরে পৌছিতে দিতেছে না। ত্যাগের ভৈরবরাগের নিকট অন্যান্য রাগ-রাগিণী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। ত্যাগই হইল আসল কথা—ত্যাগী না হইলে কেহই পরের জন্য ষোলআনা প্রাণ দিয়া কাজ করিতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে—সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, এবং ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্ব্বোচ্চ গৌরব-শিখরে আরোহণ করিল। ইহাই রহস্য। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত কর, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহাকিছু আপনা আপনিই উন্নত হইবে।

মহাপুরুষদের পূজা

ঠিক ঠিক তত্ত্বগুলি সকলের সম্মুখে ধরিতে হইবে। প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাইতে হইবে। যাঁহারা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের লোকের কাছে আদর্শরূপে দাঁড় (খাড়া) করিতে হইবে। যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ,

মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। বৃন্দাবনলীলা-ফিলা এখন থাক ; চতুর্দ্দিকে সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালাইতে হইবে এবং সমস্ত দৈনন্দিন কার্য্যে সেই সর্ব্বশক্তিদায়িনী আনন্দময়ীর পূজা চালাইতে হইবে। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করিয়া সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানিবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

আদর্শ—মহাবীরচরিত্র

মহাবীরের চরিত্রকেই এখন আদর্শ করিতে হইবে। রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গাইয়া চলিয়া গেল ! জীবন-মরণে দৃকপাত নাই —মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান ! দাস্যভাবের এই মহান্ আদর্শে সকলের জীবন গঠিত করিতে হইবে। এইরূপ হইলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা আপনি হইবে। দ্বিধাশূন্য হইয়া গুরুর আজ্ঞাপালন, আর ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা—এই হইতেছে কৃতী হইবার একমাত্র গূঢ়োপায় ; "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোক-সন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না। রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব-লাভে পর্য্যন্ত ! শুধু রঘুনাথের আদেশ-পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। কখনও মনে দুর্ব্বলতা আসিতে দিবে না। মহাবীরকে স্মরণ করিও —মহামায়াকে স্মরণ করিও। দেখিবে সব দুর্ব্বলতা—সব কাপুরুষতা তখনি চলিয়া যাইবে।

এখন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-পূজায় কোন ফল হইবে না।

বাঁশি বাজাইয়া এখন আর দেশের কল্যাণ হইবে না। খোল-করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তনে লম্ফঝম্প করিয়া দেশটা উৎসন্ন গেল। কাম-গন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করিতে গিয়া দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঢাক ঢোল কি দেশে তৈয়ার হয় না? তূরী ভেরী কি ভারতে মিলে না? ঐসব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনাও! ছেলেবেলা হইতে মেয়েমানুষি বাজনা শুনিয়া শুনিয়া, কীর্ত্তন শুনিয়া শুনিয়া, দেশটা যে মেয়েদের দেশ হইয়া গেল! এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা-কালী এঁদের পূজা। ডমরু শিঙ্গা বাজাইতে হইবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলিতে হইবে, 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত করিতে হইবে। যে সব music (গীতবাদ্য) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমলভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছু দিনের জন্য এখন বন্ধ রাখিতে হইবে। ধ্রুপদ গান শুনিতে লোককে অভ্যাস করাইতে হইবে। তবে ত লোকে মহা উদ্যমে কর্ম্মে লাগিয়া শক্তিমান হইয়া উঠিবে। আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিয়াছি, এদেশে এখন যাহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাহাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্কবিকার অথবা বিচারশূন্য উৎসাহ-সম্পন্ন)—মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোমাদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমতে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ফলও সেইরূপই হইতেছে—ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক। এই ত ইতিহাসে আছে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কত দেশে

উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন—তিব্বত, চীন, সুমাত্রা, সুদূর জাপানে পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছেন। রজোগুণের ভিতর দিয়া না গেলে উন্নতি হইবার উপায় আছে কি? বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে। সকল বিষয়ে বীরত্বে কঠোর মহাপ্রাণতা আনিতে হইবে। এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করিলে, তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ।

জীবন্ত উদাহরণ

তুমি যদি একা এইভাবে চরিত্রগঠন করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে দেখিয়া হাজার লোক ঐরূপ করিতে শিখিবে। কিন্তু দেখিও আদর্শ হইতে কখনও যেন একপাও হটিও না। কখনও হীন-সাহস হইও না। খাইতে, শুইতে, পড়িতে, গাইতে, বাজাইতে, ভোগে রোগে, কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিতে হইবে। তবে ত মহাশক্তির কৃপা হইবে। লেক্‌চার করিয়া এদেশে কিছু হইবে না। বাবুভায়ারা শুনিবে, বেশ বেশ করিবে, হাততালি দিবে; তারপর বাড়ী গিয়া ভাতের সঙ্গে সব হজম করিয়া ফেলিবে। পচা পুরান লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারিলে কি হইবে? ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে; তাহাকে পোড়াইয়া লাল করিতে হইবে, তখন হাতুড়ির ঘা মারিলে একটা গড়ন করিতে পারা যাইবে। এদেশে জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখাইলে কিছুই হইবে না। কতকগুলি ছেলে চাই যাহারা সব ত্যাগ করিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে। তাহাদের life (জীবন) আগে তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে, তবে কাজ হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যবান হও

মেরুদণ্ডের দুইটি বিভিন্ন দেশ দিয়া প্রবাহিত ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি শক্তিপ্রবাহ এবং মেরুমজ্জার মধ্যদেশস্বরূপ সুষুম্না—এই তিনটি প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী আছে। শক্তিবহন-কেন্দ্রগুলি সুষুম্নার মধ্যেই অবস্থিত। রূপকভাষায় উহাদিগকে পদ্ম বলে। পদ্মগুলির মধ্যে সকলের নিম্নদেশস্থটি সুষুম্নার সর্ব্বনিম্নভাগে অবস্থিত—উহার নাম মূলাধার, উহার উপরে পর পর স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সর্ব্বশেষ মস্তিষ্কস্থ সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। সর্ব্বনিম্নদেশবর্ত্তী মূলাধার ও সর্ব্বোচ্চদেশে অবস্থিত সহস্রার—সর্ব্বনিম্ন চক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত। যোগীরা বলেন, মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত আছে, যাহার মস্তকে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলী হয়, ইহাই ওজোধাতুর শক্তি। এক ব্যক্তি অতি সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে, তাহা নহে, তবু তাঁহার কথায় লোক মুগ্ধ হইতেছে। ওজঃশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে কোন কার্য্য করেন, তাহাতেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। সকল মনুষ্যের ভিতরেই অল্পাধিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে; শরীরের মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার

উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ। ইহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে পরিণত হইতেছে। বহির্জগতে যে শক্তি তাড়িত বা চৌম্বুক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ শক্তিরূপে পরিণত হইবে, পৈশিক শক্তিগুলিও ওজোরূপে পরিণত হইবে। যোগীরা বলেন, মানুষের মধ্যে যে শক্তি কাম-ক্রিয়া, কাম-চিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা দমিত হইলে সহজেই ওজোধাতুরূপে পরিণত হইয়া যায়। আর আমাদের শরীরস্থ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীরা উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে, সমুদয় কামশক্তিটিকে লইয়া ওজোধাতুতে পরিণত করেন। কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই সর্ব্বদেশে ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মানুষ সহজেই দেখিতে পায় যে, কামকে প্রশ্রয় দিলে সমুদয় ধর্ম্মভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজঃ সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে যে ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই সেই সম্প্রদায়েরই ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য আছে। এই ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণভাবে কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনধিকার চর্চ্চায় বা বৃথা কাজে যে শক্তিক্ষয় করে, অভিষ্ট কার্য্যসিদ্ধির জন্য পর্য্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাইবে? The sum total of the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity, অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার যে শক্তি

বর্ত্তমান রহিয়াছে উহা সসীম; সুতরাং সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর অন্যভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি—মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। উহা ব্যতীত মানসিক তেজ আর কিছুতেই হইতে পারে না। যত মহা মহা মস্তিষ্কশালী পুরুষ দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যবান ছিলেন।

গুরু ও শিষ্য

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে গুরু বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও সুকৃষ্ট থাকা আবশ্যক। যেখানে এই উভয়টিই বিদ্যমান, সেইখানেই অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য। আবার শক্তিসঞ্চারের গুরু সম্বন্ধে আরো অনেক বিঘ্ন আছে। অনেকে আছেন, যাঁহারা স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও অহঙ্কারে আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করেন, শুধু তাহাই নহে, অপরকেও নিজ স্কন্ধে লইয়া যাইবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥" (কঠ, ২।৫)

জগৎ এবম্বিধ জনগণে পরিপূর্ণ—সকলেই গুরু হইতে চাহে, "আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।" এইরূপ লোক যেরূপ সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, এই সকল আচার্য্যেরাও তদ্রূপ। ইঁহাদের দ্বারা আমাদের কোন কাজ হইবে না। তাঁহারা যদি প্রত্যক্ষ অনুভব না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কি শিখাইবেন ?

উত্তম গুরু

প্রকৃত গুরু কে ? 'শ্রোত্রিয়'—যিনি বেদের রহস্যবিৎ, 'অবৃজিন' —নিষ্পাপ, 'অকামহত'—যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থ-সংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শান্ত, তিনিই সাধু। বসন্তকাল আগমন করিলে যেমন বৃক্ষে পত্রমুকুলোদয় হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্ত্তে কোনপ্রকার প্রত্যুপকার চাহে না, কারণ উহার প্রকৃতিই অপরের হিতসাধন। পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এইরূপ। আর কেহই গুরু হইতে পারে না। গুরু সম্বন্ধে এইটুকু বুঝা আবশ্যক যে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হন। যে গুরু শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন ও মনকে কেবল শব্দের শক্তিদ্বারা চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়া ফেলেন। শাস্ত্রের মর্ম্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মাচার্য্য। দ্বিতীয়তঃ, গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে লোকে বলিয়া থাকে, "গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন দেখিবার প্রয়োজন কি ? তিনি যাহা বলেন, সেইটি লইয়াই আমাদের কাজ করা আবশ্যক।" এ কথা ঠিক নহে। প্রথম তিনি কি চরিত্রের লোক, তাহা দেখা আবশ্যক ;

তারপর তিনি কি বলেন, তাহা দেখিতে হইবে। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক; তবেই তাঁহার কথায় প্রকৃত একটা গুরুত্ব থাকে; কারণ তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত শক্তিসঞ্চারকের যোগ্য হইতে পারেন। নিজের মধ্যে যদি শক্তি না রহিল, তবে তিনি সঞ্চার করিবেন কি? তৃতীয়তঃ—গুরুর উদ্দেশ্য কি, দেখা আবশ্যক। গুরু যেন অর্থ, নাম বা যশরূপ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন—সমুদয় মানবজাতির প্রতি পবিত্র প্রেমই যেন তাঁহার কার্য্যের নিয়ামক হয়। যদি দেখ, গুরুতে এইসব লক্ষণগুলিই বর্ত্তমান, তবে জানিবে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। নতুবা তাঁহার নিকট শিক্ষায় বিপদ আছে।

উত্তম শিষ্য

শিষ্যের এই গুণগুলি আবশ্যক—পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অশুদ্ধাত্মা পুরুষ কখন প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারে না। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে পবিত্র হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা যে বস্তু অন্তরের সহিত অনুসন্ধান না করি, আমরা সে বস্তু লাভ করিতে পারি না। যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাকুলতা প্রাণে জাগরিত না হয় ও আমরা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ না করিতে পারি ততদিন সদাসর্ব্বদা অভ্যাস ও আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যক। যে শিষ্য এইরূপ অধ্যবসায় সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আচরণ, তাঁহার আজ্ঞাবহতা ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মবিকাশ হইতেই পারে না।

তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ

আচার্য্যগণই বলিয়া গিয়াছেন—আমরা নাশ করিতে আসি নাই, পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাকে সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দোষ নিবারণ করিতে হইলে উহার কারণ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। তাঁহারা জগতের নরনারীগণকে তাঁহাদের সন্তানস্বরূপ দেখিতেন। তাঁহারাই যথার্থ পিতা, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জন্য অনন্ত সহানুভূতি এবং ক্ষমা ছিল—তাঁহারা সর্ব্বদা সহ্য এবং ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন—কি করিয়া মানবসমাজ সংগঠিত হইবে; সুতরাং তাঁহারা অতি ধীরভাবে, অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহাদের সঞ্জীবন ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোককে তাঁহারা গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরভাবে তাঁহাকে এক এক পদ করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

সৎসঙ্গের প্রভাব

আমাদের ভিতর যে সকল উত্তম সংস্কার আছে, সেগুলি এক্ষণে অব্যক্তভাব ধারণ করিয়া আছে বটে, কিন্তু উহারা আবার সৎসঙ্গের দ্বারা জাগরিত হইবে—ব্যক্তভাব ধারণ করিবে। সৎসঙ্গের অপেক্ষা জগতে পবিত্রতর কিছু নাই, কারণ, এক সৎসঙ্গ হইতেই শুভসংস্কারগুলি জাগরিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ, ভব-সমুদ্রপারের নৌকাস্বরূপ হয়। সৎসঙ্গের এতদূর শক্তি।

স্বাধীনতার সার্থকতা

বিভিন্ন-চরিত্র নরনারীর শ্রেণী সৃষ্টি-নিয়মের স্বাভাবিক বিভিন্নতা মাত্র। এই কারণেই একপ্রকার আদর্শের দ্বারা সকলের বিচার করা, বা সকলের সম্মুখে একপ্রকারের আদর্শ স্থাপন করা কোনমতেই উচিত নহে। এইরূপ প্রণালীতে কেবল অস্বাভাবিক চেষ্টার উদ্রেক হয় মাত্র। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, আর তাহার ধার্ম্মিক ও সাধু হইবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন হয়। আমাদের কর্ত্তব্য—প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টা করিতে উৎসাহিত করা এবং ঐ আদর্শ সত্যের যত নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার চেষ্টা করা। ভয় হইতে চরিত্রবান বলবান পুরুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার? অবশ্য ইহা কখনই হইতে পারে না। ভয় হইতে কি প্রেমের উৎপত্তি সম্ভব? প্রেমের ভিত্তি—স্বাধীনতা। স্বাধীনতা—মুক্তভাব হইলেই তবে প্রেম আসে। তখনই আমরা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি ও সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রাতৃভাবের অর্থ বুঝিতে পারি—তাহার পূর্ব্বে নহে।

স্বাধীনতা ইহার মূলমন্ত্র, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ—ইহার জন্মগত স্বত্ব। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিতে হয়, রাখিও। তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণের ন্যায় অভিনয় করিব। যেমন একজন যথার্থ রাজা ভিখারীর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে বাস্তবিক ভিক্ষুক যে, সে রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতেছে। উভয়ে কত প্রভেদ

দেখ! দৃশ্য উভয়স্থলেই সমান, বাক্যও হয়ত সমান, কিন্তু কি পার্থক্য! একজন ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অপরে যথার্থ দারিদ্র্যকষ্টে প্রপীড়িত। কেন এই পার্থক্য হয়? কারণ, একজন মুক্ত, অপরে বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দারিদ্র্য সত্য নহে, ইহা কেবল তিনি অভিনয়ের জন্য অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু যথার্থ ভিক্ষুক জানে, ইহা তাহার চিরপরিচিত অবস্থা—তাহার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এই দারিদ্র্য সহ্য করিতেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা অভেদ্য নিয়মস্বরূপ, সুতরাং সে কষ্ট পায়। তুমি আমি যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি ততক্ষণ আমরা ভিক্ষুক মাত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সমুদয় জগতে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি,—শেষে কাল্পনিক জীবগণের নিকট পর্য্যন্ত সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু কোনকালে এই সাহায্য আসিল না। তথাপি ভাবিতেছি, এইবার সাহায্য পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়া আছি, ইতোমধ্যে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে লাগিল।

মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে, তোমরা সর্ব্বদাই বৃথা অপরের নিকট সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কখনও পাও নাই; যাহা কিছু পাইয়াছ সবই আপনার ভিতর হইতে। তুমি নিজে যাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছ তাহাই ফলরূপে পাইয়াছ,

তথাপি কি আশ্চর্য্য, তুমি সর্ব্বদাই অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ।

চাই অকপট সরলতা, পবিত্রতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি।

সম্প্রসারণই জীবন

জীবনের প্রথম সুস্পষ্ট চিহ্ন—বিস্তার। যদি তোমরা বাঁচিতে চাও, তবে তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইতে হইবে। বিস্তার জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয়ের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ, আর এই বিস্তারের সহিত মানুষের সমস্ত জ্ঞানসমষ্টিতে আমাদের যাহা দিবার আছে, সমস্ত জগতের উন্নতিবিধানে আমাদের যেটুকু দেয় ভাগ আছে, তাহাও ভারতেতর জগতে যাইতেছে। তবে ভারতের দান—ধর্ম্ম, দার্শনিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা। আর ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর তাহা ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্ত্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন—সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। সমগ্র ভারতসন্তানগণের এক্ষণে কর্ত্তব্য—তাহারা যেন সমগ্র জগৎকে মানবজীবনসমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে উপযুক্ত করে। তাহারা সমগ্র জগৎকে ধর্ম্ম শিখাইতে ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ বাধ্য। আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই পাশ্চাত্ত্যদেশ জয় করিবে।

সাম্প্রদায়িকতা-দোষ

আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্মিক সত্য বলিয়া ভ্রম করি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীর ধর্ম্মানুভূতি মনে করি; তাই সাম্প্রদায়িকতা, তাই বিরোধ। যদি আমরা একবার বুঝিতে পারি, প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা হইলে আমরা নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব— আমরা ধর্ম্মের সত্যসমূহ উপলব্ধির পথে কতদূর অগ্রসর। তাহা হইলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা নিজেরাই অন্ধকারে ঘুরিতেছি ও অপরকেও সেই অন্ধকারে ঘুরাইতেছি। আর ইহা বুঝিলেই আমাদের সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইবে।

সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের ফলস্বরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই ধর্ম্মোন্মত্ততা জগতে মহা উপদ্রবরাশি উৎপাদন করিয়াছে, কতবার ইহাকে নরশোণিতে পঙ্কিল করিয়াছে, সভ্যতার নিধন সাধন করিয়াছে ও যাবতীয় জাতিকে সময়ে সময়ে হতাশার সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছে। এই ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্ব্বাপেক্ষা কতদূর উন্নত হইত!

বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সুপরিচালনের জন্য সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু আমাদের পরস্পর বিবাদ করিবার কি প্রয়োজন আছে, যখন আমাদের অতি প্রাচীন শাস্ত্রসকল ঘোষণা করিতেছে যে, এই ভেদ আপাততপ্রতীয়মান মাত্র। এই সকল আপাতদৃষ্ট বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐ সকলের মধ্যে সম্মিলনের স্বর্ণসূত্র রহিয়াছে, ঐ সকলগুলির মধ্যেই সেই পরম মনোহর একত্ব রহিয়াছে। আমাদের অতি

প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ঘোষণা করিয়াছেন, 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' জগতে একমাত্র বস্তুই বিদ্যমান—ঋষিগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে বর্ণন করেন। অতএব যদি এই ভারতে—যেখানে চিরদিন সকল সম্প্রদায়ই সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন, সেই ভারতে যদি এখনও এই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর এই দ্বেষ হিংসা থাকে, তবে ধিক্ আমাদিগকে, যাহারা সেই মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

সমন্বয়াচার্য্য মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ

এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন—সকল সম্প্রদায় এক আত্মা, এক ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত দরিদ্র দুর্ব্বল পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকলের উদ্ভাবন করিবে, যাহাতে ভারতান্তর্গত বা ভারত-বহির্ভূত সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের সমন্বয়-সাধন করিবে ও এইরূপ অদ্ভুত সমন্বয়-সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যভাবে উন্নতিসাধক সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ আজকাল আমাদের বিশেষ কল্যাণপ্রদ।

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট আমি একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি—উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অদ্ভুত সত্য যে জগতের ধর্ম্মসমূহ পরস্পরবিরোধী নহে। উহারা এক সনাতন ধর্ম্মের বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ কোনও ধর্ম্মকে কখনও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতেন না; তাহাদের ভিতর এই এই ভাব ঠিক নয়, একথা তিনি বলিতেন না। তিনি উহাদের ভালর দিকটাই দেখাইয়া দিতেন। তদীয় মুখ হইতে কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই; এমন কি, তিনি কাহারও সমালোচনা পর্য্যন্ত করিতেন না। তদীয় নয়ন জগতে কিছু মন্দ দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিল। তিনি ভা্ল ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বত্র যে এক গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্যই তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল।

যত মত তত পথ

যে কোন ব্যক্তি যে পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সেই পথে চলিতে দিতে হইবে; কিন্তু যদি আমরা তাহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, তবে তাহার যাহা আছে, সে তাহাও হারাইবে; সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। যেমন একজনের মুখ আর একজনের সঙ্গে মিলে না, সেইরূপ একজনের প্রকৃতি আর একজনের সঙ্গে মিলে না। যে দেশে সকলকে একপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে দেশ ক্রমশঃ ধর্ম্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। যদি কখন পৃথিবীর সর্ব্বলোক এক ধর্ম্মমতাবলম্বী হইয়া একপথে চলে, তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের

স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব একেবারে বিনষ্ট হইবে। ভেদই আমাদের জীবনযাত্রার মূলমন্ত্র। সম্পূর্ণরূপে ভেদ চলিয়া গেলে সৃষ্টিও লোপ পাইবে। যতদিন চিন্তাপ্রণালীর এই বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিন আমরা বর্ত্তমান থাকিব। আমাদের আর্টও যে একটা ধর্ম্মের অঙ্গ। যে মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কত বড় আর্টিষ্ট (শিল্পী) ছিলেন। এখন চাই আর্ট এবং কার্য্যকারিতার (utility) সংযোগ-সাধন। জাপান উহা বেশ চট্ করিয়া নিয়াছে, তাই এত শীঘ্র বড় হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান তোমাকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়, তাহাই অবলম্বন কর; কিন্তু বিভিন্ন পথ লইয়া বিবাদ করিও না। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবাদ করিবে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি ঈশ্বর-পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ—তুমি সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া পিছু হটিতেছ, ক্রমশঃ পশু-পদবীতে উপনীত হইতেছ। কাহারও সহিত বিবাদ-বিতর্কে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও, অন্যের খবরে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও, অপরে নিজ নিজ ভাব লইয়া থাকুক। সকলকেই একপথে যাইতে হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই, ইহাতে বরং ক্ষতিই হইয়া থাকে। সুতরাং সকলকে এক পথ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কোটী কোটী নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন এবং যাহা আমি অতি বাল্যাবস্থা হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমি সেই শ্লোকার্দ্ধটি আজ তোমাদের নিকট বলিতেছি, যথা—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

অর্থাৎ হে প্রভো, ভিন্ন ভিন্ন রুচিহেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথগামী মানবের, নদীসমূহের সাগরতুল্য, তুমিই একমাত্র গম্যস্থান।

বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। "কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে ইত্যাদি।" যখন হৃদয়ের মধ্যে মহা যাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এযাত্রা আলো দেখিতে পাইব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্য্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্ত্তি পায়। ক্ষীর ননী খাইয়া, তুলার উপর শুইয়া, একফোঁটা চক্ষের জল কখনও না ফেলিয়া, কে কবে বড হইয়াছে, কাহার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হইয়াছেন?

আমি হয়ত একটি ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদ, তুমি হয়ত একটি পর্ব্বত-প্রায় তরঙ্গ; হইলই বা। সেই অনন্ত সমুদ্র তোমারও যেমন, আমারও সেইরূপ আশ্রয়। সেই প্রাণ, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অনন্ত সমুদ্রে তোমারও যেমন আমারও তদ্রূপ অধিকার। আমার জন্ম হইতেই—আমারও যে জীবন আছে ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পর্ব্বতপ্রায় উচ্চ তোমার ন্যায় আমিও সেই অনন্ত জীবন, অনন্ত শিব ও অনন্ত শক্তির সহিত নিত্য সংযুক্ত। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের সন্তানগণকে তাহাদের জন্ম হইতেই এই জীবনপ্রদ, মহত্ত্ববিধায়ক, উচ্চ, মহান তত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর।

শিক্ষক ও ছাত্র

শিশুতে অনন্ত শক্তি নিহিত

শিক্ষা অর্থে মানবের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহাকেই প্রকাশ করা। অতএব শিশুগণকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ-বিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে,' প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ, আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে; তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্ত্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এইভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা-পূরণে সমর্থ হইবে। ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষের সমুদয় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে উহাদের বীজে রহিয়াছে।

প্রাচীন পন্থা—গুরুগৃহে বাস

আমার বিশ্বাস—গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া গুরুগৃহে বাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলির কথাই ধর। পঞ্চাশ বৎসর উহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—কিন্তু ফলে কি দাঁড়াইয়াছে? উহারা একজনও মৌলিকভাবসম্পন্ন

ব্যক্তি প্রসব করে নাই। উহারা কেবলমাত্র পরীক্ষাসভ্যরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। একজন জ্বলন্ত character-এর (চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির) কাছে ছেলেবেলা হইতে থাকা চাই, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ পড়িলে কিছুই হইবে না। Absolute (সম্পূর্ণ নিখুঁত) ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করাইতে হইবে প্রত্যেক ছেলেটিকে; তবে ত শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসিবে, তাহা না হইলে যাহার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই, সে মিথ্যা কথা কেন বলিবে না? আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগীলোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার হইয়াছে। যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করিয়াছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল। ভারত চিরকাল মাথায় জুতা বহন করিবে যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শিখাইবার ভার না পড়ে। ছোট ছেলেদের পড়িবার উপযুক্ত একখানাও বই নাই। "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ," "দুলাল অতি সুবোধ বালক"—ইহাতে কোন কাজ হইবে না। ইহাতে মন্দ বই ভাল হইবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ হইতে ছোট ছোট গল্প লইয়া অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাংলাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে বই লিখা প্রয়োজন। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াইতে হইবে। ছেলেগুলি যাহাতে আপনার আপনার হাত, পা, নাক, কান, মুখ, চোখ ব্যবহার করিয়া নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া নিতে শিখে, এইটুকু করিয়া দিতে হইবে—তাহা হইলেই আখেরে সমস্তই সহজ হইয়া পড়িবে। কিন্তু গোড়ার কথা ধর্ম্ম—ধর্ম্মটা যেন

ভাত আর সবগুলি তরকারি। কেবল শুধু তরকারি খাইলে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। অনেক কতকগুলি কেতাব-পত্র মুখস্থ করাইয়া মানুষগুলির মুণ্ড বিগড়াইয়া দিতেছে। আমাদের এখন প্রয়োজন সেই প্রাচীনকালের 'গুরুগৃহবাস' ও তদনুরূপ প্রথাসকলের। চাই পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জান, ছোট ছেলেদের গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা গোছের শিক্ষা দেওয়াটা তুলিয়া দিতে হইবে একেবারে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর, কারণ তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্য্যবান, স্থির অকপট হৃদয় হইতে উত্থিত—উহার প্রত্যেক সুরটিই অমোঘ। সেই প্রাচীনকালের ভাব আনয়ন কর, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্য্যবান হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। ইহা ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই।

তোমাদের মধ্যে যাহারা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের বই পড়িয়াছ তাহারা মঠ-প্রথায় শিক্ষা (monastery system of education) কি তাহা জান। ইহা এক সময়ে ইউরোপে পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে ইহার দ্বারা বেশ সুফলও হইয়াছিল। এই প্রথানুসারে একজন পণ্ডিতের অধীনে একটি স্কুল থাকে এবং গ্রামের লোকেরা তাহার খরচ বহন করে। এই পাঠশালাগুলি খুব মোটা-মুটিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়। আমাদের শিক্ষার উপায়গুলি বড়ই সরল—প্রত্যেক ছাত্রকে বসিবার জন্য একখানি করিয়া ছোট মাদুর আনিতে হয়, আর লিখিবার কাগজ হয় প্রথমে তালপাতা,

কারণ তাহাদের পক্ষে কাগজের দাম খুব বেশী। প্রত্যেক ছাত্র মাতুর বিছাইয়া বসিয়া নিজের দোয়াত ও পুঁথি বাহির করিয়া লেখা আরম্ভ করে। পাঠশালায় একটু অঙ্ক, একটু-আধটু সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সামান্য ভাষাও শিক্ষা দেয়। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী, যাহা এখনও দেশের অনেক স্থলে প্রচলিত, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের সংসৃষ্ট শিক্ষা—আধুনিক প্রণালী হইতে অনেক পৃথক। সেই শিক্ষা-প্রণালীতে ছাত্রগণকে বেতন দিতে হইত না। তাঁহাদের এই ধারণা ছিল, জ্ঞান এতদূর পবিত্র বস্তু যে, কাহারও উহা বিক্রয় করা উচিত নয়। কোন মূল্য না লইয়া অবাধে জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে। আচার্য্যেরা ছাত্রগণকে বিনা বেতনে নিজেদের নিকট রাখিতেন; আর শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছাত্রগণকে অশন-বসন প্রদান করিতেন। এই সকল আচার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহজন্য বড়-লোকেরা বিবাহ শ্রাদ্ধাদি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিতেন। বিশেষ বিশেষ দানের অধিকারী বলিয়া তাঁহারা বিবেচিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে আবার তাঁহাদের ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিতে হইত। আগে শিষ্যেরা 'সমিৎপাণি' হইয়া গুরুর আশ্রমে গমন করিত। গুরু অধিকারী বলিয়া বুঝিলে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া বেদপাঠ করাইতেন এবং কায়মনোবাক্যদণ্ডরূপ ব্রতের চিহ্নস্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা তাহার কোমরে বাঁধিয়া দিতেন।

জ্ঞানই জ্ঞানের উন্মেষকারী

আমাদিগের অভ্যন্তরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে বটে, কিন্তু অপর এক জ্ঞানের দ্বারা উহাকে উত্তেজিত করিতে হইবে। জানিবার শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে বটে, কিন্তু উহাকে উত্তেজিত

করিতে হইবে। আর যোগীরা বলেন, ঐরূপে জ্ঞানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে। জড়, অচেতন ভূত কখন জ্ঞান বিকাশ করাইতে পারে না—কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাহার উন্মেষের জন্য জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং এই গুরুগণের সর্ব্বদাই প্রয়োজন ছিল। জগৎ কখনও এই সকল আচার্য্য-বিরহিত হয় নাই। বর্ত্তমান কালের দার্শনিকগণ যে বলিয়া থাকেন, মানুষের জ্ঞান তাহার আপনার ভিতর হইতে উৎপন্ন হয়, একথা সত্য বটে, সমুদয় জ্ঞানই মানুষের ভিতরে রহিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ জ্ঞানের উন্মেষের জন্য তাহার কতকগুলি সহকারী অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। আমরা গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না।

উপযুক্ত হও

খুব কম লোকেই চিন্তার অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গুহায় বসিয়া উহার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া যথার্থ একটিমাত্রও মহৎ চিন্তা করিয়া মরিতে পারে, সেই চিন্তা সেই গুহার প্রাচীর ভেদ করিয়া সমগ্র আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে ঐ ভাব সংক্রামিত হইবে। চিন্তার এইরূপ অদ্ভুত শক্তি। অতএব তোমার ভাব অপরকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না, প্রথমে দিবার মত কিছু সঞ্চয় কর। তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁহার কিছু দিবার আছে; কারণ, শিক্ষাপ্রদান বলিতে কেবল বচন বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান নহে; শিক্ষাপ্রদান অর্থে বুঝায় ভাব-সঞ্চার। অতএব প্রথমে চরিত্র গঠন

কর—এইটিই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য। আগে নিজে সত্য কি তাহা জান, পরে অনেকে তোমার নিকট শিখিবে, তাহারা সব তোমার নিকট আসিবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিল—'যখন কমল প্রস্ফুটিত হয়, তখন ভ্রমরগণ আপনা আপনিই মধু খুঁজিতে আসিয়া থাকে। এইরূপে যখন তোমার হৃৎপদ্ম ফুটিবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা লইতে আসিবে।' এইটি জীবনের এক মহা শিক্ষা। যে ব্যক্তি তাঁহার কথাগুলিতে নিজের সত্তা, নিজের জীবন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারই কথায় ফল হয়, কিন্তু তাঁহার মহাশক্তি-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার অর্থই আদান-প্রদান—আচার্য্য দিবেন, শিষ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আচার্য্যের কিছু দিবার বস্তু থাকা চাই, শিষ্যের গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।

সহানুভূতিসম্পন্ন হও

তিনিই প্রকৃত আচার্য্য, যিনি তাঁহার শিষ্যের প্রবৃত্তি বা রুচি অনুযায়ী নিজের সমস্ত শক্তিটা প্রয়োগ করিতে পারেন। প্রকৃত সহানুভূতি ব্যতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ; গুরুর সহিত আমাদেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। যেখানে গুরুশিষ্যের এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে গুরু কেবল বক্তা মাত্র—নিজের প্রাপ্যের দিকেই দৃষ্টি, আর শিষ্য কেবল গুরুর কথাগুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করেন ও অবশেষে উভয়েই নিজের নিজের পথ দেখেন।

প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করা ও তাহার সহিত সেইরূপভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত,

আর তাহাকে কোনমতে বা কোনরূপে ঘৃণা, নিন্দা বা কোনরূপ তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করা উচিত নহে। আর ইহা যে শুধু সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য তাহা নহে, সকল নরনারীরই ইহা কর্ত্তব্য। অপরের অধিকারে হাত দিতে যাইও না, আপনার সীমার ভিতর আপনাকে রাখ, তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। উপদেষ্টার কর্ত্তব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিঘ্নগুলি সরাইয়া দেওয়া। অসদ্‌গুরুর নিকট ত জ্ঞানলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই বরং তাঁহার শিক্ষায় বিপদাশঙ্কা আছে। অসদ্‌গুরুর শিক্ষায় কিছু মন্দ জিনিস শিখিবার আশঙ্কা আছে।

জীবন গড়িবার উপায়

কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিও না। যদি পার, তাহাকে কিছু ভাল জিনিস দাও। যদি পার, মানুষ যেখানে অবস্থিত আছে, তথা হইতে তাহাকে একটু উপরে ঠেলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্যনামের যোগ্য, যিনি অল্পায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজ আত্মা শিষ্যের আত্মায় সংক্রামিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্য্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন উপকার করিতে পারেন না। সাধারণকে কেবল positive ideas (সকল বিষয়ে গড়িয়া তুলিবার আদর্শ) দিতে হইবে। Negative thoughts ('নেই নেই' ভাবরাজি) মানুষকে নির্জীব করিয়া দেয়।

দেখ না, যে সকল মা বাবা ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে, 'এটার কিছু হবে না', 'বোকা গাধা',—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাহাই হইয়া দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বলিলে, উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যাহা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চ অধিকারের তুলনায় যাহারা ঐরূপ শিশুদের মত তাহাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive idea (জীবন গড়িবার ভাব) দিতে পারিলে সাধারণে মানুষ হইয়া উঠিবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যে সব চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করিতেছে, তাহাতে ভুল না দেখাইয়া ঐসব বিষয় কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করিতে পারে তাহাই বলিয়া দিতে হইবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখাইলে মানুষের feelings wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখিয়াছি—যাহাদের আমরা হেয় মনে করিতাম, তাহাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়া জীবনের মতিগতি ফিরাইয়া দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দেওয়ার রকমই ছিল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যাহার দোষ তাহাকেই বুঝাইয়া বলা ভাল, আর তাহার গুণ দিয়া ঢাক বাজানই উচিত। ঠাকুর বলিতেন যে, মন্দ লোককে ভাল ভাল করিলে সে ভাল হইয়া যায়; আর ভাল লোককে মন্দ মন্দ করিলে সে মন্দ হইয়া যায়। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছুই হইবে না; কিন্তু মূল কারণের অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তাহার পর উহা দূর কর, তাহা হইলে উহার

ফলস্বরূপ দোষ আপনিই চলিয়া যাইবে। চীৎকারে কোন ফল হইবে না। তাহাতে বরং অনিষ্টই আনয়ন করিবে।

প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা

সুতরাং মানুষ যেন নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে। আর যদি সে এমন গুরু পায়, যিনি তাহার ভাবানুযায়ী এবং সেই ভাবের পুষ্টিবিধায়ক উপদেশ দেন, তবেই সে উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহাকে সেই ভাবের বিকাশসাধন করিতে হইবে। সুতরাং শিষ্যের প্রয়োজনানুযায়ী উপদেশও বিভিন্নরূপ হওয়া দরকার। অতীত বহু বহু জন্মের ফলে যাহার যেমন সংস্কার গঠিত হইয়াছে, তাহাকে তদনুযায়ী উপদেশ দাও। যে যেখানে আছে, তাহাকে সেইখান হইতে ঠেলিয়া তুলিয়া দাও। অপরের প্রবৃত্তি উল্টাইয়া দিবার নামটি পর্য্যন্ত করিও না, তাহাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই ক্ষতি হইয়া থাকে। যখন তুমি জ্ঞান শিক্ষা দাও, তখন তোমাকে জ্ঞানী হইতে হইবে, আর শিষ্য যে অবস্থায় রহিয়াছে, তোমাকে মনে মনে ঠিক সেই অবস্থায় অবস্থিত হইতে হইবে। কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যাহা কিছু অবশ্যক গ্রহণ করে ও স্বভাবানুযায়ী বাড়িতে থাকে, তুমি সেইভাবে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পার। যখনই দেখ যে, অপরের কথা হইতে কোন জিনিস শিখিতেছ, জানিও যে পূর্ব্বজন্মে তোমার সেই বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল; কারণ অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক।

সেবা

অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্ব্বলতা, কোনরূপ বাহ্যানুষ্ঠান শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক—সাহসী সর্ব্বজয়ী সর্ব্বংসহ হউক। এই সকল গুণসম্পন্ন হইতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে আত্মার মহিমা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে।

সকল ব্যক্তিকেই তাহার আভ্যন্তর ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে। উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ একথা বলিতে সাহসী হয় যে, আমি অমুক রমণী বা অমুক ছেলেটির মুক্তি দিয়া দিব, তবে উহা অতি অন্যায় কথা, অত্যন্ত ভুল কথা বলিতে হইবে। সরিয়া দাঁড়াও! উহারা আপনাদের সমস্যা আপনারাই পূর্ণ করিবে। তুমি কে যে, তুমি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া লইয়াছ? তোমরা খোদার উপর খোদকারি করিতে সাহস কর কিসে? তোমরা কি জান না, সকল আত্মাই পরমাত্মাস্বরূপ? অতএব প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ভাবিও না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই।

শিক্ষক ও ছাত্র

ওঁ সহনাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহবীর্য্যং করবাবহৈ ॥
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

—আমরা যাহা অধ্যয়ন করিলাম, তাহা যেন আমাদের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে এবং উভয়ের পুষ্টিবিধান করে; উহা দ্বারা আমাদের বীর্য্য উৎপন্ন হউক। আমাদের অধীত বিদ্যা জ্ঞানরূপ শক্তিপ্রদানে সমর্থ হউক। আমরা—আচার্য্য ও শিষ্য—যেন কখনও পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

অবরোধ-প্রথার দ্বারা রমণীগণকে কখন কি রক্ষা করা যায় ? সংশিক্ষা ও দেবভক্তি-প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিত হন।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

স্ত্রী-শিক্ষা

প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছ, কিন্তু যাহারা তোমাদের সুখদুঃখের ভাগী—সকল সময়ে প্রাণ দিয়া সেবা করে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে, তাহাদিগকে উন্নত করিতে তোমরা কি করিতেছ ? তোমাদের ধর্ম্মানুশাসনে, তোমাদের দেশের রীতিনীতি অনুযায়ী কোথায় কতটা স্কুল হইয়াছে ? দেশের পুরুষদের মধ্যেই তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই, তা আবার মেয়েদের ভিতর ! গভর্ণমেণ্টের সংখ্যাসূচক তালিকায় (statistics) দেখা যায়, ভারতবর্ষে শতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে শতকরা একজনও হইবে না। এইরূপ না হইলে কি দেশের এমন দুর্দ্দশা হয় ? শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞানের উন্মেষ—এইসব না হইলে দেশের উন্নতি কি করিয়া হইবে ? তোমরা দেশে যে কয়জন লেখাপড়া শিখিয়াছ—দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভিতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা, উদ্যম দেখিতে পাই না। কিন্তু জানিও, সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের ভিতর শিক্ষাবিস্তার না হইলে কিছুই হইবার উপায় নাই। বিভিন্ন যুগে যে অনেক

অসভ্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, প্রধানতঃ তাহার জন্যই ভারতমহিলা এত অনুন্নত। কতকটা ভারতবাসীর নিজের দোষ। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, দৈহিক ও নৈতিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দ্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা রমণীকে সন্তান উৎপাদন করিবার দাসীস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, 'তাহার কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনেও উদয় হয় না।

আমাদের ধর্ম্ম স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে মোটেই বাধা দেয় না। "কন্যাপ্যেবং ' পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—ঠিক এইভাবে বালিকাদেরও পালিত এবং শিক্ষিত হওয়া উচিত। প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে বালক এবং বালিকা উভয়েরই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সমস্ত জাতির শিক্ষা উপেক্ষিত হইয়াছিল।

আমেরিকার মহিলা

আমেরিকা একটি অদ্ভুত দেশ। দরিদ্র ও স্ত্রী-জাতির পক্ষে ঐ দেশ নন্দনকাননস্বরূপ। সেই দেশে দরিদ্র একরূপ নাই বলিলেই চলে এবং অন্য কোথাও মেয়েরা ঐ দেশের মেয়েদের মত স্বাধীন, শিক্ষিত ও উন্নত নহে। ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকান নারী আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় উন্নতির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত বলিয়া শিক্ষায় তত মনোযোগ দিতে পারে না। মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় কার্য্যের জীবনস্বরূপ। সৎপুরুষ আমাদের

দেশেও অনেক, কিন্তু সেই দেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু"[১]—যে দেবী সুকৃতি পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমানা—একথা বড়ই সত্য। তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখিয়াছি। সকল কাজ তাহারাই করে। স্কুল, কলেজ মেয়েতে ভরা; আমাদের পোড়া দেশে মেয়েদের পথ চলিবার উপায় নাই। আর তাহাদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কম কাহারও বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজারহাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রফেসর—সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! আর ওদের কত দয়া! যাহাদের পয়সা আছে, তাহারা দিনরাত গরিবদের উপকারে ব্যস্ত। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" (যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, দেবতারাও তথায় আনন্দ করেন)—বৃদ্ধ মনু বলিয়াছেন। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ে ১১ বৎসরে বিবাহ না হইলে খারাপ হইয়া যাইবে! আমরা কি মানুষ? আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্য কীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া অধোগতি হইয়াছে। প্রভু বলিয়াছেন, "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী"[২] (তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা) ইত্যাদি। আর আমরা বলিতেছি—"দূরমপসর রে চণ্ডাল" (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যাও)। মনু বলিয়াছেন, ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত

---

১ চণ্ডী—৪।৫

২ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষা হইবে, তেমনই মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করিতেছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে; নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না। তাহারা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—সাক্ষাৎ জগদম্বা; তাহাদের পূজা করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ হাজার আমাদের দেশে তৈয়ার করিয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব। তবে তোমাদের দেশের লোক মানুষ হইবে।

শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদভাঙ্গ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলিয়া জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। আমেরিকানরা তাহাই দেখে; এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহা কৃপা। তাহারা তাহাই করে। আর তাহারা সেইজন্য সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা-হেয়, অপবিত্র বলি। তাহার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

বৈদিক যুগ ও বর্ত্তমান

এ দেশে পুরুষ ও মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন করিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে ত বলে, একই চিৎসত্ত্বা সর্ব্বভূতে বিরাজ করেন। তোমরা মেয়েদের নিন্দাই কর; কিন্তু তাহাদের উন্নতির জন্য কি করিয়াছ বল দেখি? স্মৃতি-ফৃতি লিখিয়া, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করিয়া এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে

পুত্র-উৎপাদনের যন্ত্র-মাত্র করিয়া তুলিয়াছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের না তুলিলে বুঝি তোমাদের আর উপায়ান্তর আছে? ভারতের অধঃপতন হইল, ভট্টাচার্য্য-ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর জাতিকে যখন বেদপাঠের অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখিতে পাইবে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্ম-বিচারে ঋষিস্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। হাজার বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্ম-বিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন। এইসব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাকিবে না কেন? একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার অবশ্য ঘটিতে পারে, ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকরাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ আছে ত? তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্ত্তা ছিলেন বাকপটু কুমারী বাচক্নবী—তখনকার দিনে ঐরূপ মহিলাদিগকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত।* তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার এই প্রশ্নদ্বয় দক্ষ ধনুষ্কের হস্তস্থিত দুইটি শাণিত তীরের ন্যায়; এইস্থলে তাঁহার নারীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত তোলা হয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাপরিষদসমূহে বালকবালিকার সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর সাম্যভাব আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি পড়—শকুন্তলার উপাখ্যান পড়, তারপর দেখ—টেনিসনের 'প্রিন্সেস্' হইতে আর আমাদের নূতন কিছু শিখিবার আছে কিনা।

জাতির জীবনের মানদণ্ড-নিরূপণ

ভালমন্দ সকল স্থলেই আছে। আমেরিকায় কতশত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি, কতশত জননী দেখিয়াছি যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্য-স্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, কতশত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা 'ডায়নাদেবীর ললাটস্থ তুষার-কণিকার ন্যায় নির্ম্মল', আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপগণ্ডগুলির দ্বারা তৎসম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না, কারণ উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র, তাহা দ্বারাই জাতির জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে। একটি আপেল গাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে, যে সকল অপক্ক, অপরিণত, কীটদষ্ট ফল মাটিতে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও তুমি কি তাহাদের সাহায্যে বিচার কর? যদি একটি সুপক্ক ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়া যায় তবে সেই একটি দ্বারাই ঐ আপেল গাছের শক্তি, সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়—যেসব শত শত ফল অপরিণত, তাহাদের দ্বারা নহে।

প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হইতে সেই জাতির রীতিনীতি বিচার করিতে হইবে। তাহাদের চোখে তাহাদের দেখিতে হইবে। আমাদের চোখে ইহাদের দেখা, অথবা ইহাদের চোখে আমাদের দেখা—এই দুটিই

ভুল। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে .লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। আমি জাতির দুইটি দিকই দেখিয়াছি, আর আমি জানি, যে জাতি সীতা-চরিত্র প্রসব করিয়াছে, ঐ চরিত্র যদি কেবল কাল্পনিকও হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, নারী জাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই।

আদর্শ— সীতাচরিত্র

ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; রমণীচরিত্রের যতপ্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা-চরিত্রেরই আশ্রিত; আর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ-পত্নী সীতা, সেই নরলোকের, এমন কি, দেবলোকের পর্য্যন্ত আদর্শীভূতা মহনীয়-চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্ত্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং উহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক করে না। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি আমাদের

বেদ পর্য্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃতভাষা পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আমার বাক্য অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে অতিশয় গ্রাম্য-ভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গঠিত করিবার যে সকল চেষ্টা হইতেছে, যদি সে সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি, ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকা মাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় রমণীগণের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—পরমবিশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্ব্বংসহা সীতার ন্যায় হওয়া। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্ত্তিমতী ভারতমাতা। সীতাচরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে, সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেমন উহা প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোন পৌরাণিক উপাখ্যান তেমন করে নাই। সীতা নামটিও

ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্যময়, তাহারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাক, সীতা বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সীতার কথা কি বলিব! তোমরা জগতের প্রাচীন সাহিত্য সমগ্র অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পার, আর আমি তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পার, কিন্তু আর একটি সীতা-চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতা-চরিত্র অসাধারণ; ঐ চরিত্র ঐ একবার মাত্রই চিত্রিত হইয়াছে। আর কখনও হয় নাই, হইবেও না।

প্রকৃত শক্তিপূজা

আমাদের দেশ সকল দেশের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—এখানে শক্তির অবমাননা বলিয়া। শক্তির কৃপা না হইলে কিছুই হইবে না। আমেরিকা, ইউরোপে কি দেখিয়াছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা; তবু ইহারা না জানিয়া পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যাহারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করিবে, তাহাদের কি কল্যাণ না হইবে? আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশে যে নারীপূজার কথা শুনিয়া থাকি, সাধারণতঃ উহা নারীর সৌন্দর্য্য ও যৌবনের পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নারীপূজা বলিতে বুঝিতেন, সকল নারী সেই আনন্দময়ী মা ব্যতীত কিছুই নহেন—তাঁহারই পূজা। আমি নিজে দেখিয়াছি—সমাজ যাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, তিনি এইরূপ স্ত্রীলোকদের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পদতলে পতিত হইয়া

অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বলিতেছেন, "মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, আর একরূপে তুমি সমগ্র জগৎ হইয়াছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি; মা, তোমাকে প্রণাম করি।" ভাবিয়া দেখ, সেই জীবন কিরূপ ধন্য, যাহা হইতে সর্ব্ববিধ পশুভাব চলিয়া গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক রমণীকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার নিকট সকল নারীর মুখ অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কেবল সেই আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রীর মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন। মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাতি কখন বড় হইতে পারে নাই, কস্মিন্‌কালে পারিবেও না। তোমাদের জাতির যে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা।

জন্মগত শুভাশুভ সংস্কার

মাকে কেন এত শ্রদ্ধাভক্তি করিব? কারণ—আমাদের শাস্ত্র বলে জন্মগত শুভাশুভ সংস্কারই শিশুর জীবনে ভালমন্দের প্রভাব বিস্তার করে। শত সহস্র কলেজেই যাও, লক্ষ লক্ষ বই-ই পড়, আর জগতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গেই মিশ, পরিণামে দেখিবে যে, জন্মগত শুভ-সংস্কারই তোমার সাফল্যের যথার্থ কারণ। জন্ম হইতে তোমার সদসৎ অদৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—জন্ম হইতেই শিশু হয় দেব, না হয় দানব—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। শিক্ষা এবং অপরাপর জিনিস সব পরে আসে এবং তাহাদের প্রভাব অতি সামান্য। তুমি যেমন জন্ম পাইয়াছ, তেমনি থাকিবে। খারাপ স্বাস্থ্য লইয়া জন্মিয়াছ, এখন সমগ্র ঔষধালয় সেবন করিলেই

কি তুমি সারাজীবনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে? দুর্ব্বল, রুগ্ন, দূষিতরক্ত পিতামাতা হইতে সুস্থ, সবল কয়জন সন্তান জন্মাইতে পারে? বল—কয়জন?—একটিও নয়। সৎ বা অসৎ প্রবৃত্তির প্রবল সংস্কার লইয়া আমরা জগতে আসি। জন্ম হইতেই আমরা দেব বা দানব। আমাদের জীবনের উপর শিক্ষা বা অন্য কিছুর প্রভাব প্রকৃতপক্ষে অতি সামান্য। শাস্ত্রের বিধান—জন্মের প্রাক্কালীন প্রভাবসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। 'মাকে পূজা করিব কেন? কারণ তিনি পবিত্রা। কঠোর তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি নিজেকে পুণ্যস্বরূপিণী করিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য-আদর্শ

জাতির জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধকে পবিত্র ও বিচ্ছেদহীন করিতে হইবে এবং তাহারই সাহায্যে মাতৃপূজার উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইবে। রোমান-ক্যাথলিক ও হিন্দুগণ বিবাহকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য করিয়া বহু শক্তিশালী স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। আরবদের দৃষ্টিতে বিবাহ একটা চুক্তি, একটা বলপূর্ব্বক অধিকার মাত্র—উহা ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং আমরা তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর আদর্শ পাই না। বৌদ্ধধর্ম্ম এমন কতকগুলি জাতির মধ্যে পড়িয়াছে, যাহাদের সমাজে এখনও বিবাহপ্রথার অভিব্যক্তি হয় নাই, সুতরাং ঐসব দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের নামে সন্ন্যাসের প্রহসন চলিতেছে। তোমাদের যেমন ধারণা যে ব্রহ্মচর্য্যই জীবনের পরম গৌরব, আমারও তেমনি এই একটি বিষয়ে চোখ খুলিয়া গিয়াছে যে, ঐরূপ শক্তিশালী আকুমার ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীর সৃষ্টির

জন্য সর্ব্বসাধারণের বৈবাহিক জীবনকে পুণ্যময় করিয়া তোলা আবশ্যক। এদেশে প্রত্যেক বালিকাকে সাবিত্রীর ন্যায় সতী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে—মৃত্যুও তাঁহার প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। তিনি ঐকান্তিক প্রেম-বলে যমের নিকট হইতেও নিজ স্বামীর আত্মাকে ফিরাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ সীতা-সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না। পাশ্চাত্ত্যে মেয়েদের দেখিয়া আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হইত না—ঠিক যেমন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালায়, আফিসে যায়, স্কুলে যায়, প্রফেসারি করে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা বিনয় দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পাইয়াও তোমরা ইহাদের উন্নত করিতে পারিলে না! ইহাদের ভিতর জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করিলে না! ঠিক ঠিক শিক্ষা পাইলে ইহারা আদর্শ স্ত্রীলোক হইতে পারে।

প্রকৃত শিক্ষা হইবে সমস্ত সমস্যার সমাধানকারী আর ধর্ম্ম উহার কেন্দ্র

আমাদের রমণীগণের মীমাংসিতব্য অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদিত হয় নাই। শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শিক্ষা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির, শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিসকলকে

এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থা নির্ভীক-হৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে। তাহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ-এর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্রা স্বার্থগন্ধশূন্যা বীররমণী হইবে; ভগবানের পাদস্পর্শে যে বীর্য্যলাভ হয়, তাহারা সেই বীর্য্যশালিনী হইবে; সুতরাং তাহারা বীর-প্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবে।

কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ একার্য্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণের ন্যায় আমাদের নারীগণও এ যোগ্যতালাভে সমর্থা। আমাকে বারংবার প্রশ্ন করা হইয়াছে—আপনি বিধবাদিগের ও সমগ্র রমণীজাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কি মনে করেন? আমি এই প্রশ্নের চরম উত্তর দিতেছি—আমি কি বিধবা যে আমাকে এই বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি কি স্ত্রীলোক যে আমাকে বার বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে হে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হইয়াছ—তুমি কি প্রত্যেক বিধবার ও প্রত্যেক রমণীর অন্তর্য্যামী সাক্ষাৎ ভগবান নাকি? তফাৎ! উহারা আপনাদের সমস্যার সমাধান আপনারাই করিবে। আমি বলিতেছি

না যে, আমাদের সমাজের নারীগণের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত। শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও; তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা তোমাদিগকে বলিবে। তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে? আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। আমি নিজেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সমাজকে 'এদিকে তোমায় চলিতে হইবে, ওদিকে নয়'—বলিয়া আদেশ করিতে সাহস করি না। জাতীয় জীবনের পুষ্টির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা উহাকে দিয়া দাও, কিন্তু উহা আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী আপনার দেহ গঠন করিয়া লইবে। আমাদের কার্য্য হইতেছে স্ত্রী, পুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তাহারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, সব বুঝিতে পারিবে ও আপনারা মন্দটা করা ছাড়িয়া দিবে। তখন আর জোর করিয়া সমাজের কোন বিষয় ভাঙ্গিতে গড়িতে হইবে না।

ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলিই মেয়েদের শিখান উচিত। নভেল, নাটক ছুঁইতে দেওয়া উচিত নয়। কেবল পূজাপদ্ধতি শিখাইলেই হইবে না, সব বিষয়ে চোখ ফুটাইয়া দিতে হইবে। আদর্শ নারী-চরিত্রসকল ছাত্রীদের সম্মুখে সর্ব্বদা ধরিয়া উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাহাদের অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করিতে হইবে।

তবে কি জান, শিক্ষাই বল আর দীক্ষাই বল, ধর্ম্মহীন হইলে তাহাতে গলদ থাকিবেই থাকিবে। এখন ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া রাখিয়া স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা গৌণ হইবে। ধর্ম্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতোদ্‌যাপন এইজন্য শিক্ষার দরকার। বর্ত্তমানকালে এ পর্য্যন্ত ভারতে যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মটাকেই গৌণ করিয়া রাখা হইয়াছে। সেইজন্যই তোমরা যেসব দোষের কথা বল, সেগুলি হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া স্ত্রী-শিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাহাদের ঐরূপ বে-চালে পা পড়িয়াছে। সকল সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তককেই অভীপ্সিত কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। নতুবা তাহার কাজে গলদ বাহির হইবেই। আমি ধর্ম্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। আমার বিবেচনায় অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ বিষয়েও তদ্রূপ শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণানুযায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নত করিবার এমন সহজপথ দেখাইয়া দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে হয়।

আত্মরক্ষায় সমর্থা ও ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা করা

যেরকম শিক্ষা চলিতেছে, সেরকম নহে। সত্যিকার কিছু শিখা চাই। খালি বইপড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না, যাহাতে চরিত্র গঠিত হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই। ঐ রকম শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা আপনারাই সমাধান করিবে।

আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একটা কিছু হইলে কেবল কাঁদিতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শিখা দরকার। এ সময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, ঝাঁসীর রাণী কেমন ছিলেন! সেজন্য আমার ইচ্ছা আছে—কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈয়ারী করিব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যাইয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হইবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবে। কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাজ করিতে হইবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র করিতে হইবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করিতে হইবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদেয় শিক্ষার ভার নিবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রীদের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করিতে হইবে। কালে যাহাতে তাহারা ভাল গিন্নী তৈয়ারী হয়, তাহাই করিতে হইবে। এই সকল মেয়েদের সন্তান-সন্ততিগণ পরে ঐ সকল বিষয়ে আরও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। যাহাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাহাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়। স্ত্রীলোক না হইলে কি ছাত্রীদের এমন করিয়া শিক্ষা দিতে পারে? শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের উপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্ব্বদা রাখা উচিত। এদেশে স্ত্রী-বিদ্যালয়ে পুরুষ-সংস্রব একেবারে না রাখাই

ভাল। মেয়েদের তোমরা এখন যেন কতকগুলি munufacturing machine (পুত্রোৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ) করিয়া তুলিয়াছ। রাম, রাম! এই কি তোমাদের শিক্ষার ফল হইল? মেয়েদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। তারপর নিজেরাই ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় করিবে। বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেও এইরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চভাবের প্রেরণা দিবে ও বীর পুত্রের জননী হইবে। তাহাদের দেখিয়া ও তাহাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উল্টাইয়া যাইবে। এখন ধরিয়া বিবাহ দিতে পারিলেই হইল—তা নয় বৎসরেই হউক, দশ বৎসরেই হউক! এখন এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে তের বৎসরের মেয়ের সন্তান হইলে গুষ্টিশুদ্ধর আহ্লাদ কত; তাহার ধুমধামই বা দেখে কে? এই ভাবটা উল্টাইয়া গেলে ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্ধাও আসিতে পারিবে। যাহারা ঐরকম ব্রহ্মচর্য্য করিবে, তাহাদের ত কথাই নাই—কতটা শ্রদ্ধা, কতটা নিজেদের উপর বিশ্বাস তাহাদের হইবে, তাহা মুখে বলা যায় না।

ক্রমে সব হইবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায় নাই, যাহারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হইয়া নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখিতে পারে। এই দেখ না—এখনও মেয়ে বার-তের বৎসর পার হইতে না হইতে লোকভয়ে, সমাজভয়ে বিবাহ দিয়া ফেলে। এই সেদিন 'সম্মতি-সূচক আইন' করিবার সময় সমাজের নেতারা লক্ষ লোক জড় করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, 'আমরা আইন চাই না!' —অন্য দেশ হইলে সভা করিয়া চেঁচান দূরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুজিয়া লোক ঘরে বসিয়া থাকিত ও ভাবিত—

'আমাদের সমাজে এখনও এহেন কলঙ্ক রহিয়াছে।' -বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করিয়া অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হইয়া দেশের ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সক্ষম ও সবল না হইলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মিবে কিরূপে? লেখাপড়া শিখাইয়া একটু বয়স হইলে বিবাহ দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মিবে, তাহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হইবে। তোমাদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তাহার কারণ হইতেছে—এই বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ কমিয়া গেলে বিধবার সংখ্যাও কমিয়া যাইবে। আমার মত এই যে, বাল্যবিবাহের মূল তত্ত্বটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া মেয়ে পুরুষ সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই; তাহা না হইলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হইবে।

ভালমন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্যবিবাহ তুলিয়া দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মাথা না ঘামাইয়া, আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে স্ত্রীপুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া; সেই শিক্ষার ফলে তাহারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ সব বুঝিতে পারিবে ও আপনারাই মন্দটা করা ছাড়িয়া দিবে। তখন আর জোর করিয়া সমাজের কোন বিষয় ভাঙ্গিতে গড়িতে হইবে না। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্য্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার

উপরে কোন জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না—উহা নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর।

চিন্তা ও কার্য্যে প্রতিবন্ধকহীনতার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা ও সংস্কৃতি (culture) পুরুষদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে অর্থাৎ যেখানে পুরুষেরা উচ্চশিক্ষিত, স্ত্রীলোকেরাও সেখানে উচ্চশিক্ষিতা। পরন্তু পুরুষেরা শিক্ষিত না হইলে স্ত্রীলোকেরাও হয় না। সামাজিক ব্যাধি-প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহা দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়। যদি তুমি কাহাকেও সিংহ হইতে না দাও, তাহা হইলে সে ধূর্ত্ত শৃগাল হইয়া দাঁড়াইবে। স্ত্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী, কিন্তু এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহার কারণ পুরুষে তাহার উপর অত্যাচার করিতেছে। এখন সে শৃগালীর মত; কিন্তু যখন তাহার উপর আর অত্যাচার হইবে না, তখন সে সিংহী হইয়া দাঁড়াইবে। জোর করিয়া সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে তাহাতে সংস্কার বা উন্নতির গতিরোধ হয়। কাহাকেও বলিও না—'তুমি মন্দ।' বরং তাহাকে বল, 'তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও।'

সতীত্ব ও স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়

মেয়েদের শিখাইতে হইবে, নিজেদেরও শিখিতে হইবে। খালি বাপ হইলেই ত হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করিতে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা ত সহজে দেওয়া যাইতে পারে—হিন্দুর মেয়ে, সতীত্ব কি জিনিস তাহা তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবে; ইহাতে তাহারা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত কিনা! প্রথমে সেই ভাবটাই তাহাদের মধ্যে উস্‌কাইয়া দিয়া (উত্তেজিত করিয়া) তাহাদের চরিত্রগঠন করিতে হইবে—যাহাতে তাহারা, বিবাহ হউক বা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যে রকম সময় পড়িয়াছে, তাহাতে তাহাদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল হইতে আছে, তাহারই বলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি চিরকুমারী রাখিয়া ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাহাতে তাহাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হইতে পারে, তাহাও শিখাইতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা অতি সহজেই ঐসব শিখিতে পারিবে, ঐরূপ শিখিতে আনন্দও পাইবে। আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য ঐরকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী-গুরুগ্রহণ, সেই জন্যই নারী-ভাবসাধন, সেই জন্যই মাতৃভাবপ্রচার, সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠস্থাপনের প্রথম উদ্যোগ। যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে

অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নাই। এই জন্য এদের আগে তুলিতে হইবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করিতে হইবে।

আদর্শ স্ত্রীমঠস্থাপন-পরিকল্পনা

গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি লওয়া হইবে। তাহাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকিবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকিবে। আর ভক্তিমতী গৃহস্থের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিতে পারিবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংশ্রব থাকিবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর হইতে স্ত্রী-মঠের কার্য্যভার চালাইবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকিবে; তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, এমন-কি অল্প-বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হইবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্ম্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শিখান হইবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা—এসব ত শিক্ষার অঙ্গ থাকিবেই। যাহারা বাড়ী ছাড়িয়া একেবারে এখানে থাকিতে পারিবে, তাহাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ হইতে দেওয়া হইবে। যাহারা তাহা পারিবে না, তাহারা এই মঠে দৈনিক-ছাত্রীস্বরূপে আসিয়া পড়াশুনা করিতে পারিবে। এমন কি মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকিতে ও যতদিন থাকিবে খাইতেও পাইবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নিবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাহাদের বিবাহ দিতে পারিবে। যোগ্যাধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হইলে অভিভাবকদের মত নিয়া ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ব্রতাবলম্বনে

অবস্থান করিতে পারিবে। যাহারা চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন করিবে, তাহারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হইয়া দাঁড়াইবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিবে। চরিত্রবতী, ধর্ম্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হইবে। স্ত্রী-মঠের সংশ্রবে যতদিন থাকিবে ততদিন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা এই মঠের ভিত্তিস্বরূপ হইবে। ধর্ম্মপরতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হইবে; আর সেবাধর্ম্ম তাহাদের জীবনব্রত হইবে। এইরূপ আদর্শ-জীবন দেখিলে কে তাহাদের না সম্মান করিবে—কেই বা তাহাদের অবিশ্বাস করিবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইরূপে গঠিত হইলে তবে ত তোমাদের দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হইবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন হইয়া তোমাদের মেয়েরা এখন কি যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা একবার পাশ্চাত্ত্য দেশ দেখিয়া আসিলে বুঝিতে পারিতে। মেয়েদের ঐ দুর্দ্দশার জন্য তোমরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগাইয়া তোলাও তোমাদের হাতে রহিয়াছে। সেইজন্যই বলি, কাজে লাগিয়া যাও। মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলিয়া তাহাদের মানুষ করিতে বলি। মেয়েরা মানুষ হইলে তবে ত কালে তাহাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জাগিয়া উঠিবে।

আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, রমণীগণকেও ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন কর,

তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ ; ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিতা না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর ; আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্রগুণে অপরকে দিবার আছে। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম্ম প্রচার করিলে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্ত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোন নারীর এ সাহস হইবে না ? প্রভু জানেন !

জন-শিক্ষা

সামাজিক অত্যাচার

আমি নিউইয়র্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম—বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় উপনিবেশস্থাপনার্থ আসিতেছে। তাহাদের দেখিলে বোধ হইত যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে, পদদলিত, আশাহীন, এক পুঁটলি কাপড় কেবল তাহাদের সম্বল—কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিসের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাতের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা। এখন মজা দেখ, ছয় মাস পরে সেই লোকগুলিই আবার উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সোজা হইয়া চলিতেছে—সকলের দিকেই নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিতেছে। এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কিসে করিল? মনে কর, সে ব্যক্তি আরমেনিয়া অথবা অপর কোথা হইতে আসিতেছে—সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না, সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত, 'তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম; একটু যদি নড়তে চড়তে চেষ্টা করিস্ ত তোকে পিষে ফেলব।' চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম তুই, গোলাম আছিস্—যা আছিস্, তাই থাক্। জন্মেছিলি যখন, তখন যে নৈরাশ্য-অন্ধকারে জন্মেছিলি, সেই নৈরাশ্য-অন্ধকারে সারাজীবন পড়িয়া থাক্।' সেখানকার হাওয়ায় যেন তাহাকে গুন্ গুন্ করিয়া বলিত—'তোর কোন আশা নেই—গোলাম হইয়া চিরজীবন নৈরাশ্য-অন্ধকারে পড়িয়া থাক্।' সেখানে বলবান ব্যক্তি পিষিয়া

তাহার প্রাণহরণ করিয়া লইয়াছিল। আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল একজন উত্তম-বস্ত্র-পরিহিত ভদ্রলোক তাহার করমর্দ্দন করিল। সে যে চীরপরিহিত, আর ভদ্রলোকটি যে উত্তম-বস্ত্র-ধারী, তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন—সেই টেবিলের এক প্রান্তে তাহাকে বসিবার জন্য বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, দেখিল এ এক নূতন জীবন ; সে দেখিল এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতরে সেও একজন মানুষ। হয়ত সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া আসিল, হয়ত সে তথায় দেখিল দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামসমূহ হইতে মলিন-বস্ত্র-পরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম—মায়াবশে এইরূপ দুর্ব্বলভাবাপন্ন হইয়াছিল! এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, মনুষ্যপূর্ণ জগতের মধ্যে সেও একজন মানুষ!!

তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ

তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে এই আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।

আমাদের এই দেশে, এই বেদান্তের জন্মভূমিতে আমাদের সাধারণলোককে শত শত শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এইরূপ অবনতভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি। তাহাদিগকে বলা হইতেছে, 'নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোদের জন্ম—থাক্ চিরকাল এই নৈরাশ্য-অন্ধকারে।' আর তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা ক্রমাগত ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে আরও গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে। অবশেষে মনুষ্যজাতি যতদূর নিকৃষ্টতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে, ততদূর পৌঁছিয়াছে। কারণ, এমন দেশ আর কোথায় আছে যেখানে মানুষকে গোমহিষাদির সঙ্গে একত্র শয়ন করিতে হয়? যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খাইয়া থাকে, আর দশ বিশ লাখ্ সাধু আর ক্রোর দশ ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষিয়া খায়, আর তাহাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম্ম না পৈশাচ নৃত্য! এইটি ভাল করিয়া বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি! আমেরিকা দেখিয়াছি! কারণ বিনা কার্য্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি?

সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥

—(সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুইটি বাক্য আছে – পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ হয়।) সত্য নয় কি? এইসব দেখিয়া—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখিয়া আমার ঘুম হয় না। যদি কাহারও আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশাভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! পাশ্চাত্ত্যে সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, সুবিধা আছে। আজ গরিব, কাল সে ধনী হইবে, বিদ্বান হইবে, জগৎমান্য হইবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরিব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? কয়জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাহাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করিয়াছ, তাহাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দিবার জন্য কি করিয়াছ, বলিতে পার? তোমরা তাহাদের ছোঁও না, 'দূর দূর' কর,—আমরা কি মানুষ! ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরিতেছেন, তাঁহারা ঐ অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরিবদের জন্য কি করিয়াছেন? যাহারা জাতির মেরুদণ্ড—যাহাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মিতেছে—যে মেথর মুদ্দাফরাস একদিন কাজ বন্ধ করিলে শহরে হাহাকার রব উঠে, হায়! তাহাদের সহানুভূতি করে, তাহাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেহই নাই! এই দেখ না, হিন্দুদের সহানুভূতি না পাইয়া মান্দ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পারিয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। মনে করিও না কেবল পেটের দায়ে খ্রীষ্টান হয়;

আমাদের সহানুভূতি পায় না বলিয়া। ইচ্ছা হয় ঐ ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এখনই যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস্'—বলিয়া তাহাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডাকিয়া নিয়া আসি। ইহারা না জাগিলে মা জাগিবেন না। আমরা ইহাদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা যদি না করিতে পারিলাম, তবে আর কি হইল? হায়! ইহারা দুনিয়াদারী কিছু জানে না, তাই দিনরাত খাটিয়াও অশন-বসনের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। দাও, সকলে মিলিয়া ইহাদের চোখ খুলিয়া দাও—আমি দিব্য চোখে দেখিতেছি, ইহাদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রহিয়াছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত-সঞ্চার না হইলে, কোনও দেশ কোনও কালে কোথায় উঠিয়াছে, দেখিয়াছ? একটা অঙ্গ পড়িয়া গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকিলেও, ঐ দেহ লইয়া কোন বড় কাজ আর হইবে না—ইহা নিশ্চিত জানিও। হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মার বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।

আমাদের দেশে একজন বড়লোক মারা গেলে শতাব্দীকাল পরে আর একজনের অভ্যুত্থান হইয়া থাকে আর পাশ্চাত্ত্যদেশে মুহূর্ত্তে সেস্থান পূর্ণ হইয়া যায়। কারণ পাশ্চাত্ত্যে কৃতী পুরুষগণের উদ্ভবক্ষেত্র অতি বিস্তৃত আর আমাদের দেশে অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়া থাকে। ঐ দেশের শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তাই ত্রিশকোটী অধিবাসীর দেশ ভারতবর্ষ

অপেক্ষা তিন-চারি কিংবা ছয়কোটী নরনারী-অধ্যুষিত পাশ্চাত্ত্য-দেশে কৃতী পুরুষগণের উদ্ভবক্ষেত্র বিস্তৃততর।

কেহ কেহ বলেন যে, অজ্ঞ বা গরিবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জ্জনের এবং আপনার অবস্থা উন্নত করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে। ইংলণ্ডেও একথা শুনিয়াছি, 'ছোটলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের চাকুরী কে করিবে?' মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকার ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!!! সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা?— না, এই তুমি আমি দশজন বড় জাত!!!

জাতিভেদ

কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগকে হীনাবস্থায় আনিতে পারি, একথা যদি সত্য হয়, তবে কর্ম্মের দ্বারা আমাদের অবস্থার উন্নতিসাধনও নিশ্চয়ই সাধ্যায়ত্ত। আরও কথা এই, জনসাধারণ কেবল যে নিজেদের কর্ম্মের দ্বারাই নিজদিগকে এই হীনাবস্থায় আনিয়াছে, তাহা নহে। সুতরাং তাহাদিগকে উন্নত করিবার আরও সুবিধা দিতে হইবে। আমি সব জাতিকে একাকার করিতে বলি না। জাতি-বিভাগ খুব ভাল। এই জাতি-বিভাগ-প্রণালীই আমরা অনুসরণ করিতে চাই। জাতি-বিভাগ যথার্থ কি, তাহা লক্ষের মধ্যে একজনও বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন

দেশ নাই, যেখানে জাতি নাই। ভারতে আমরা জাতি-বিভাগের মধ্য দিয়া উহার অতীত অবস্থায় গিয়া থাকি। জাতি-বিভাগ এই মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতি-বিভাগ-প্রণালীর উদ্দেশ্য হইতেছে—সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়, তবে দেখিবে, এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হইয়াছেও। আরও অনেক হইবে। কাহাকেও নামাইতে হইবে না—সকলকে উঠাইতে হইবে। জাতি-বিভাগ কখনও যাইতে পারে না, তবে উহাকে মাঝে মাঝে নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। প্রাচীন সমাজপ্রণালীর ভিতর এমন জীবনীশক্তি আছে, যাহাতে সহস্র সহস্র নূতন প্রণালী গঠিত হইতে পারে।

রজোগুণের প্রয়োজনীয়তা

এ দেশের লোকগুলির রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হইয়া আছে—ধমনীতে যেন রক্ত ছুটিতে পারিতেছে না—সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হইয়া যেন এলাইয়া পড়িয়াছে! আমি তাই ইহাদের ভিতর রজোগুণ বাড়াইয়া কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলিকে আগে ঐহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করিতে চাই। শরীরে বল নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নাই! কি হইবে এই জড়পিণ্ডগুলি দ্বারা? আমি নাড়াচাড়া দিয়া ইহাদের ভিতর সার আনিতে চাই—এইজন্য আমার প্রাণান্ত পণ! বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে ইহাদের জাগাইব। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—এই অভয়বাণী শুনাইতেই আমার জন্ম। তোমরা ঐ কার্য্যে আমার সহায় হও। যাও, গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডাল

ব্রাহ্মণকে শুনাও গিয়া। সকলকে ধরিয়া ধরিয়া বল গিয়া 'তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী।' এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর—জীবন-সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর। তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের কথা তাহাদের বল। আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত করিয়া দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাও, উত্তম অশন-বসন—উত্তম ভোগ আগে করিতে শিখুক, তারপর সর্ব্বপ্রকার ভোগের বন্ধন হইতে কি করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া দিও।

সহানুভূতি

জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয় নাই। ইহারা মানববুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কলের ন্যায় একইভাবে এতদিন কাজ করিয়া আসিতেছে—আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা ইহাদের পরিশ্রম ও উপার্জ্জনের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছে; সকল দেশেই ঐরূপ হইয়াছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই! ইতরজাতিরা ক্রমে ঐকথা বুঝিতে পারিতেছে ও তাহার বিরুদ্ধে সকলে মিলিয়া দাঁড়াইয়া আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকায় ইতরজাতিরা জাগিয়া উঠিয়া ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ভারতেও তাহার লক্ষণ দেখা দিয়াছে—ছোটলোকদের ভিতর আজকাল এত যে ধর্ম্মঘট হইতেছে উহাতেই ঐ কথা বুঝা যাইতেছে। এখন হাজার চেষ্টা করিলেও ভদ্রজাতিরা, ছোটজাতিদের আর দাবাতে পারিবে না। এখন ইতরজাতিদের ন্যায্য অধিকার পাইতে সাহায্য করিলেই ভদ্রজাতিদের কল্যাণ।

তাইত বলি, তোমরা এই জনসাধারণের (mass-এর) ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাহাতে হয়, তাহাই কর। ইহাদের বুঝাইয়া বল গিয়া—"তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ, আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করি না।" তোমাদের এই sympathy (সহানুভূতি) পাইলে ইহারা শতগুণ উৎসাহে কার্য্যতৎপর হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে ইহাদের জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দাও। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি ইহাদের শিখাও। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচিবে। আদান-প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইবে। জ্ঞানোন্মেষ হইলেও কুমার কুমারই থাকিবে, জেলে জেলেই থাকিবে, চাষা চাষই করিবে। জাতি-ব্যবসায় ছাড়িবে কেন? "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ"—এইভাবে শিক্ষা পাইলে ইহারা নিজ বৃত্তি ছাড়িবে কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম্ম যাহাতে আরও ভাল করিয়া করিতে পারে, সেই চেষ্টা করিবে। দুই-দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাহাদের ভিতর হইতে উঠিবেই উঠিবে। তাহাদের তোমরা (ভদ্রজাতিরা) তোমাদের শ্রেণীর মধ্যে তুলিয়া লইবে। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছিল, তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতিটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হইয়াছিল, বল দেখি? ঐরূপ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইলে মানুষ ত দূরের কথা, পশুপক্ষীও আপনার হইয়া যায়। এইজন্য বলি, এইসব নীচজাতির ভিতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান করিয়া ইহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে যত্নশীল হও। ইহারা যখন জাগিবে—আর একদিন জাগিবে নিশ্চয়ই—তখন তাহারাও

তোমাদের কৃত উপকার বিস্মৃত হইবে না, তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা অর্জ্জিত অর্থে বিদ্যার্জ্জন করিয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া উহাদের কথা একটিবারও চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাদিগকে আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া অভিহিত করি। যতদিন ভারতের কোটী কোটী লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, ততদিন তাহাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যাহারা তাহাদের দিকে চাহিয়াও দেখে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলিয়া মনে করি। যতদিন ভারতের বিশকোটী লোক ক্ষুধার্ত্ত পশুর তুল্য থাকিবে, ততদিন যেসব বড়-লোক তাহাদের পিষিয়া টাকা রোজগার করিয়া জাঁকজমক করিয়া বেড়াইতেছে অথচ তাহাদের জন্য কিছুই করে না, আমি তাহাদের হতভাগ্য বলি। তোমার দ্বারে স্বয়ং নারায়ণ কাঙ্গালবেশে আসিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন! তাঁহাকে কিছু না দিয়া, খালি নিজের ও নিজের স্ত্রীপুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্ব্য, চোষ্য দিয়া পূর্ত্তি করা—সে ত পশুর কাজ! ভারতের চিরপতিত বিশকোটী নরনারীর জন্য কাহার হৃদয় কাঁদিতেছে? তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাহাদের জন্য কাহার হৃদয় কাঁদে বল? তাহারা অন্ধকার হইতে আলোতে আসিতে পারিতেছে না—তাহারা শিক্ষা পাইতেছে না, কে তাহাদের কাছে আলো লইয়া যাইবে, বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাহাদের কাছে আলো লইয়া যাইবে? ইহারাই তোমাদের ঈশ্বর, ইহারাই তোমাদের দেবতা হউক—ইহারাই তোমাদের ইষ্ট হউক!

তাহাদের জন্য ভাব, তাহাদের জন্য কাজ কর, তাহাদের জন্য সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখাইয়া দিবেন। তাঁহাদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁহাদের হৃদয় হইতে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তাহা না হইলে সে দুরাত্মা। তাহাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হউক। আমি তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, অভিশাপ নিন্দা ও গালি-বর্ষণের দ্বারা কোন সদুদ্দেশ্য সাধিত হয় না। অনেক বর্ষ ধরিয়া ত ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে কোন সুফল প্রসব করে নাই। কেবল ভালবাসা ও সহানুভূতি দ্বারাই সুফলপ্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে।

এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, ব্যবহারকুশলতা (practicality) আদৌ নাই। উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্তমত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহা ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না। তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভালমন্দ-বিচারের শক্তি সকলের আছে। কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন।

একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্যদিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক, কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকারা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগত-ভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটী কোটী স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্তপ্রেম বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটী কোটী কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধি নাশ করিতে সক্ষম।

দুর্ব্বলকে অধিক সাহায্য প্রয়োজন

ভারতের সমস্ত দুর্দ্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্ত্যদেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, আর আমাদের—দেব-প্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিদ্যায় বড় অজ্ঞ। কিন্তু তাহারা বড় ভাল। কারণ, এখানে দারিদ্র্য একটা রাজদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইহারা

দুর্দ্দান্তও নহে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অনেকসময় আমার পোশাকের দরুন জনসাধারণ খেপিয়া অনেকবার আমাকে মারিবার যোগাড়ই করিয়াছিল। কিন্তু ভারতে কাহারও অসাধারণ পোশাকের দরুন জনসাধারণ মারিতে উঠিয়াছে, এরকম কথা ত কখনও শুনি নাই। অন্যান্য সব বিষয়েও আমাদের জনসাধারণ ইউরোপের জনসাধারণ হইতে অনেক সভ্য। তাহাদিগকে লৌকিক বিদ্যা শিখাইতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে ধীরে সাধারণের ভিতর বিস্তার করিতে হইবে। ধীরে ধীরে তাহাদের তুলিয়া লও, ধীরে ধীরে তাহাদের সমান করিয়া লও। লৌকিক বিদ্যাও ধর্ম্মের ভিতর দিয়া শিখাইতে হইবে।

কীট less manifested (অল্প অভিব্যক্ত), ব্রহ্ম more manifested (অধিক অভিব্যক্ত) আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নারায়ণ। যে কোন কার্য্য জীবের ব্রহ্মভাব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করিবার সহায়তা করে, তাহাই ভাল। যে কোন কার্য্য উহার বাধা হয়, তাহাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করিবার একমাত্র উপায়—অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা। যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক, কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্ব্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে। অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের

দশজনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা-মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম্ম। দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমাদের ঈশ্বর হউক। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে নাকি? যাহারা একটুকুরা রুটি গরিবদের মুখে দিতে পারে না, তাহারা আবার মুক্তি কি দিবে! যাহারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হইয়া যায়, তাহারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে? যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না। মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরেজ কয়জন আছে? ৬৲ টাকার জন্য নিজের পিতাভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? ৭০০ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ৬ কোটী মুসলমান, ১০০ শত বৎসর খ্রীষ্টান রাজত্বে ২০ লক্ষ খ্রীষ্টান—কেন এমন হয়? Originality (মৌলিকতা) একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা জার্ম্মান শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবীর বহুশতাব্দীপ্রোথিত দৃঢ় আসন টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছে? কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা।

জনশিক্ষাবিস্তারই সমস্ত উন্নতির মূল

আধুনিক সভ্যতার—পাশ্চাত্ত্য দেশের, ও প্রাচীন সভ্যতার—ভারত, মিশর, রোমকাদি দেশের—মধ্যে সেইদিন হইতেই প্রভেদ

আরম্ভ হইল, যে দিন হইতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষে যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি আমাদিগকে আবার উঠিতে হয় তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে—সত্যিকার জাতি, যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইতেই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। এস, আমরা উহাদের মধ্যে ভাবের প্রচার করিয়া যাই—বাকীটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে।

এজন্য আবশ্যক—(১) ধর্ম্মপ্রচার

প্রত্যেক মানব এই জগতে আপন আপন পথ বাছিয়া লয়। প্রত্যেক জাতিও তদ্রূপ। আমরা শত শত যুগ পূর্ব্বে আপনাদের পথ বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতেই হইবে। এই কারণে ভারতে যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্ম্মপ্রচার আবশ্যক।

যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম্ম—জটিল দার্শনিকতত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ। ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীন সাধারণ ভাব, তাহাই শিখাইবে প্রথমতঃ আমাদিগকে এই কার্য্যে মনোযোগী হইতে হইবে যে, আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব্ব সত্য নিহিত আছে, তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, মঠসমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে—যেন ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত মহাবাক্যের ধ্বনি উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে। ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যাহা কিছু আবশ্যক তাহা আপনিই আসিবে। কিন্তু যদি ধর্ম্মকে বাদ দিয়া লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা হইবে—লোকের হৃদয়ে উহা প্রভাব বিস্তার করিবে না। এজন্য প্রথম আত্মবিদ্যা—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শৈবসিদ্ধান্ত, অদ্বৈত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে-কোন সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য যে, 'এই জীবাত্মাতেই' অনন্তশক্তি নিহিত আছে,' পিপীলিকা হইতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'আত্মা', তফাৎ কেবল 'প্রকাশের তারতম্যে'—অবকাশ ও উপযুক্ত দেশকাল পাইলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়।

কিন্তু বিকাশ হউক বা না হউক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে—দ্বারে দ্বারে যাইয়া।

—(২) বিদ্যাশিক্ষাপ্রচার

এই সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হইবে। চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষাবিস্তার, ঐ শিক্ষার ফলে তাহারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হইতে পারে। কথা ত হইল সোজা, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় কি প্রকারে? এই আমাদের দেশে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ দয়াবান ত্যাগী পুরুষ আছেন, ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ এক-অর্দ্ধেক ভাগকে, যেমন তাঁহারা বিনা বেতনে পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন, ঐ প্রকার বিদ্যাশিক্ষক তৈয়ার করা যাইতে পারে। তাহার জন্য চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেখান হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হওয়া।

—(৩) সংস্কৃত-শিক্ষায় অনবহেলা

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষা চলিবে। কারণ, সংস্কৃতশিক্ষায় সংস্কৃত-শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। ভগবান রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিগণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় অদ্ভুত ফললাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্য্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, তাহারও নিশ্চিত কিছু কারণ আছে। তাঁহারা নিম্নজাতিসমূহের উন্নতি করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির

সর্ব্বোচ্চশিখরে আরূঢ় হউক ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত-শিক্ষাবিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। এমন কি এত বড় যে বুদ্ধ, তিনিও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত-শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া দিয়া এক বিষম ভুল করিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তখন-তখনি যাহাতে ফললাভ হয়, তাহার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ ভাবসমূহ অনুবাদ করিয়া তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা খুব ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্ব্বসাধারণের ভাষায় লোককে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্র শীঘ্র চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল; দূরে, অতিদূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরববুদ্ধি' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। তোমরা জগৎকে কতকগুলি জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে উহার বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই।

—(৪) প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা

সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জ্ঞান যাহাতে সংস্কারে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর। যতদিন পর্য্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের চিরস্থায়ী উন্নতির আশা নাই। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের

অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা। সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্য থাকিলেই ভারতে সম্মানভাজন হওয়া যায়। সংস্কৃতভাষায় জ্ঞানলাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না।

—(৫) শ্রুতিদ্বারা শিক্ষা ও বাড়ী বাড়ী যাইয়া শিক্ষা

তারপর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রবণের দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাইবে এবং শিল্পাদির যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্ম্মশালা খোলা যাইবে। কিন্তু এদেশে তাহা অতীব কঠিন। যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষমও হই তবু দরিদ্রঘরের ছেলেরা সে-সব স্কুলে পড়িতে আসিবে না। কারণ, ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোনরূপে জীবিকা-উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্ব্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে পৌঁছিতে হবে—তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। দরিদ্র বালকেরা যদি স্কুলে আসিয়া লেখাপড়া শিখিতে না পারে, তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তাহাদের শিখাইতে হইবে। গরিবেরা এত গরিব, তাহারা স্কুল পাঠশালায় আসিতে পারে না, আর কবিতা ইত্যাদি পড়িয়া তাহাদের কোনও উপকার নাই।

ভারতবর্ষের শেষ পাথরের টুকরার উপর বসিয়া—কুমারিকা অন্তরীপে মা কুমারীর মন্দিরে বসিয়া একটা বুদ্ধি স্থির করিলাম যে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, লোককে দর্শন শিক্ষা দিতেছি—এসব পাগলামি। খালিপেটে ধর্ম্ম হয় না—গুরুদেব বলিতেন না? ঐ যে গরিবরা পশুর মত জীবন-যাপন করিতেছে, তাহার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চারি যুগ উহাদের রক্ত চুষিয়া খাইয়াছি, আর দুই পদে দলন করিয়াছি।

মনে কর, যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করিয়া বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায় তাহা হইলে কালে মঙ্গল হইতে পারে কিনা! কোন একটি গ্রামের অধিবাসিগণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কোন একটি গাছের তলায় অথবা অন্য কোনস্থানে সমবেত হইয়া বিশ্রম্ভালাপে সময়াতিপাত করিতেছে। সেই সময় জন দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে গিয়া ছায়াচিত্র কিংবা ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে অথবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখাইয়া কিছু শিক্ষা দিল। এইরূপে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিসই না শিখান যাইতে পারে! তারপর যদি বিভিন্ন জাতির—জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পচ্ছলে তাহাদের নিকট বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়াইলে তাহারা যাহা না শিখিতে পারিত, তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক এইরূপে মুখে মুখে শিখিতে পারে। শহরের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীর ও

হল্ প্রস্তুত কর। কয়েকটি ম্যাজিকলণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে সেখানে গরিবদিগকে, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্য্যন্ত একত্র কর। তাহাদিগকে প্রথম ধর্ম্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক-লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও। চক্ষুই যে জ্ঞানলাভের একমাত্র দ্বার তাহা নহে—পরন্তু কর্ম্মদ্বারাও শিক্ষার কার্য্য যথেষ্ট হইতে পারে। এইরূপে তাহারা নূতন চিন্তার সহিত পরিচিত হইতে পারে, নৈতিক শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে বলিয়া আশা করিতে পারে। ঐটুকু পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য—বাকীটুকু উহারা নিজেরাই করিবে। যদি বংশানুক্রমিক ভাব-সংক্রমণ-নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর উপযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না করিয়া চণ্ডালজাতির শিক্ষায় সমুদয় অর্থ ব্যয় কর। দুর্ব্বলকে অগ্রে সাহায্য কর; কারণ দুর্ব্বলের সাহায্য করাই অগ্রে আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে সে কোনরূপ সাহায্য ব্যতীতও শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। যদি অপর জাতি তদ্রূপ বুদ্ধিমান না হয়, তবে তাহাদিগকেই কেবল শিক্ষা দিতে থাক—তাহাদিগেরই জন্য শিক্ষকসমূহ নিযুক্ত করিতে থাক।

—(৬) সামাজিক অত্যাচার বন্ধ করা।

সর্ব্বোপরি, আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এখন যে বিষম অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা

ভাবিলে হাস্যের উদ্রেক হয়। যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সে যেন সংক্রামক রোগের ন্যায় তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে। কিন্তু যখনই পাদ্রী-সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওরাইয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা (যতই ছিন্ন ও জর্জ্জরিত হউক) জামা পরিতে পায়, তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতেও প্রবেশাধিকার পায়। আমি ত এমন কোনও লোক দেখিতে পাই না, যে তখন ভরসা করিয়া তাহাকে একখানা চেয়ার দিতে ও তাহার সহিত সপ্রেম করমর্দ্দনে অস্বীকার করিতে পারে !! ইহা অপেক্ষা আর অদৃষ্টের পরিহাস কতদূর হইতে পারে ? সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দুধর্ম্মের মহান্ উপদেশসমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক। এই দরিদ্র ব্যক্তিগণকে, ভারতের এই পদদলিত সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সবলতা-দুর্ব্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে প্রত্যেক বালকবালিকাকে শুনাও ও শিখাও যে, সবল-দুর্ব্বল-উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন— সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে।

সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বল—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" (কঠোপনিষৎ ১।৩।১৪)—উঠ, জাগো, যতদিন না চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। উঠ, জাগো—আপনাদিগকে দুর্ব্বল ভাবিয়া তোমরা যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছ, উহা দূর করিয়া দাও। কেহই প্রকৃতপক্ষে দুর্ব্বল নহে—আত্মা অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ। উঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর—তোমার ভিতর যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর, তাঁহাকে অস্বীকার করিও না।

—(৭) আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করা

এই বীর্য্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে, 'আমি আত্মা। আমায় তরবারি ছেদন করিতে পারে না, কোন যন্ত্র আমাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতে পারে না; আমি সর্ব্বশক্তিমান। আমি সর্ব্বজ্ঞ।' অতএব এই আশাপ্রদ, পরিত্রাণপ্রদ বাক্যগুলি সর্ব্বদা উচ্চারণ কর। বলিও না—আমি দুর্ব্বল। আমরা সব করিতে পারি। আমরা কি না করিতে পারি? আমাদের দ্বারা সবই হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। উহাতে বিশ্বাসী হইতে হইবে। নচিকেতার ন্যায় বিশ্বাসী হও। নচিকেতার পিতা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন নচিকেতার ভিতর শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। আমার ইচ্ছা—তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই শ্রদ্ধা আবির্ভূত হউক, তোমাদের প্রত্যেকেই বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে জগৎ-পরিচালনকারী মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হও, সর্ব্বপ্রকারে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও;

আমি তোমাদের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই। উপনিষদ হইতে তোমরা এইরূপ শক্তি লাভ করিবে, উহা হইতে তোমরা এই বিশ্বাস পাইবে। এই সব উপনিষদে রহিয়াছে। তুমি যে কার্য্যই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায়-আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্ব্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা, যে যে কার্য্য করুক না কেন, যে যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক না কেন, সর্ব্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। উপনিষদনিহিত তত্ত্বাবলী জেলেমালা প্রভৃতি ইতরসাধারণে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে? ইহার উপায় শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে, বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে; উকীল যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকীল হইবে। এইরূপ অন্যান্য সকলের সম্বন্ধেই জানিতে হইবে। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অপর কার্য্য করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি একজোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না—তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? আমি কি দেশ

শাসন করিতে পারি? এই কার্য্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু—তা বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না। তুমি খুন করিলে তোমার প্রশংসা করিতে হইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমার ফাঁসি দিতে হইবে, এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার-তারতম্য উঠিয়া যাইবে। যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে তুমিও যেমন আমিও তেমন, তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা। জীবন-সমস্যা-সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। জ্ঞান কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না—উহা উচ্চশ্রেণী হইতে ক্রমে নিম্নশ্রেণীতে বিস্তৃত হইবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার চেষ্টা হইতেছে—পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নিহিত অগাধ কার্য্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে—উহাকে জাগাইতে হইবে। ভারতের মধ্যে সাম্যভাবস্থাপনে ভারতবাসী সকলের ব্যক্তিগত সমান অধিকারলাভে—অবশ্য ইহার পরিণতি হইবে।

বাহ্যসভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে

অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনিতে হইবে, সবদিকে প্রাণের বিস্তার করিতে হইবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করিতে হইবে, যাহাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবন-সংগ্রামে দেশের লোক survive করিতে (বাঁচিতে) পারিবে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এদেশ ও জাতিটা মিশিয়া যাইবে।

বড় হইবার লক্ষণত্রয়

ভারতবর্ষে তিনজন লোক পাঁচ মিনিটকাল একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে না। প্রত্যেকেই ক্ষমতার জন্য কলহ করিতে শুরু করে—ফলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিই দুরবস্থায় পতিত হয়। কোন জাতির কিংবা ব্যক্তির পক্ষে বড় হইতে হইলে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন : প্রথম—সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস। দ্বিতীয়—হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব। তৃতীয়—যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট তাহাদিগকে সহায়তা করা। কি কারণে হিন্দুজাতি তাহার অদ্ভুত বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণাবলী সত্ত্বেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? আমি বলি, হিংসা। এই দুর্ভাগা হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষ্যান্বিত এবং পরস্পরের যশঃখ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ তাহা কোনকালে কোথাও দেখা যায় নাই। তারপর ভারতবাসীরা বিগত দুই সহস্র বা ততোধিক বর্ষ ধরিয়া লোকহিতকর কার্য্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতি (nation), সর্ব্বসাধারণ

(public) প্রভৃতি তত্ত্বসম্বন্ধে তাহারা এইমাত্র নূতন ভাব পাইতেছে। সংগঠন ও সংযোগ-শক্তিই পাশ্চাত্ত্যজাতির কর্ম্ম-সাফল্যের হেতু; আর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং সহায়তা হইতেই উহার উদ্ভব হইয়া থাকে।

শক্তিসঞ্চার আবশ্যক

তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল ভাবপরায়ণতার সহিত প্রবল কার্য্যকারিতা সংযুক্ত থাকে, তাহা করিতে হইবে। জীবনের অর্থ বৃদ্ধি অর্থাৎ বিস্তার, আর বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনের গতিনিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু ; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ! দেহাবসানে কিছুই থাকে না, একথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু। Life is ever expanding, contraction is death (জীবন হইতেছে সম্প্রসারণ আর সঙ্কোচনই মৃত্যু)। এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের ধন মান ঐশ্বর্য্য —এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে। এ জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা—সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলে একটুও কম্পিত হয় না। এখন চাই গীতায় ভগবান যাহা বলিয়াছেন—প্রবল কর্ম্মযোগ, হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিতবল পোষণ করা। তবে ত দেশের লোকগুলি জাগিয়া

উঠিবে, নতুবা 'তুমি যে তিমিরে, তারাও সে তিমিরে'। এখন প্রয়োজন—জাতীয় ধমনীর ভিতর নব বিদ্যুদগ্নি-সঞ্চার। উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরে আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্ম্মী পাইব। তাহারাই সিংহের ন্যায় বিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে। তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্ত্য এবং ধর্ম্মবিশ্বাস ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব, আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরিব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ! পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত, প্রেত বই আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও, এখনও আমি বলিতেছি—এগিয়ে যাও।

মহৎ কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন—(ক) হৃদয়বত্তা

মহৎ কার্য্য করিতে হইলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক হয়।

প্রথমতঃ—হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র। কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে, জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটী কোটী দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটী কোটী লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটী কোটী ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও, তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।

—(খ) ব্যবহারকুশলতা

দ্বিতীয়তঃ—ব্যবহারকুশলতা। এই দুর্দ্দশা-প্রতিকারের কোন

উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দ্দশা-প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা-অপনোদনের জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি? হইতে পারে—প্রাচীন ভাবগুলি সব কুসংস্কারপূর্ণ, কিন্তু ঐ সকল কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের মধ্যে সুবর্ণখণ্ডসমূহ রহিয়াছে। এমন কোন উপায় কি আবিষ্কার করিয়াছ, যাহাতে খাদ বাদ দিয়া খাঁটি সোনাটুকু মাত্র পাওয়া যাইতে পারে? যদি তাহাও করিয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে তুমি দ্বিতীয় সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।

—(গ) প্রাণপণ অধ্যবসায়

কিন্তু ইহাতেও হইল না। আরও একটি জিনিসের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়। তুমি যে দেশের কল্যাণ করিতে যাইতেছ, বল দেখি, তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিত করিয়া কি বলিতে পার যে, কাঞ্চন-মান-যশ বা প্রভুত্বের বাসনা তোমার এই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে নাই? তোমরা কি পর্ব্বতপ্রায় বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ করবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রীপুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়,

যদি তোমাদের ধনমান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? তোমরা নিজপথ হইতে বিচলিত না হইয়া কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? রাজা ভর্ত্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, "নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই হউক বা যুগান্তরেই হউক, তিনিই ধীর যিনি সত্য হইতে একবিন্দুও বিচলিত না হন।"[১] তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? এই ত্রিবিধ গুণ যদি তোমার থাকে, তবেই তুমি প্রকৃত সংস্কারক, তবেই তুমি যথার্থ শিক্ষক, তবেই তুমি মানবজাতির পক্ষে মহা মঙ্গলস্বরূপ, তবেই তুমি আমাদের নমস্য। কিন্তু লোক বড়ই ব্যস্তবাগীশ, বড়ই সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য্য নাই, তাহার প্রকৃত দর্শনের শক্তি নাই—সে এখনি ফল দেখিতে চায়! ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, এই ফল সে নিজেই ভোগ করিতে চায়, প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য তাহার বড় ভাবনা নাই। সে কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য করিতে চাহে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'—কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই অধিকার নাই। ফলকামনা কর কেন? আমাদের কেবল কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। ফল যাহা হইবার হইতে দাও। কিন্তু মানুষের সহিষ্ণুতা নাই—এইরূপ ব্যস্তবাগীশ বলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র ফলভোগ

১ নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥ —নীতিশতক, ৭৪

করিতে হইবে বলিয়া, সে যাহা হউক একটা মতলব লইয়া তাহাতেই লাগিয়া যায়। জগতের অধিকাংশ সংস্কারককেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়।

জীবন্ত ঈশ্বরোপাসনা—নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা

ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কাজ করিয়া যাও। শক্তিফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোমার ভিতরেই আছে, সময় হইলেই আপনা-আপনি প্রকাশিত হইবে। তুমি কাজ করিয়া যাও; দেখিবে, এত শক্তি আসিবে যে সামলাইতে পারিবে না। পরার্থে এতটুকু কাজ করিলে ভিতরের শক্তি জাগিয়া উঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাবিলে, ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোমাদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয় তোমরা পরের জন্য খাটিয়া খাটিয়া মরিয়া যাও—আমি দেখিয়া খুশী হই। ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রাখিও, মানুষ চাই, পশু নহে—যাহারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্নপ্রদান করিবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবে আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যাহারা পশুপদবীতে উপনীত হইয়াছে, তাহাদের মানুষ করিবার জন্য আমরণ চেষ্টা করিবে। তোমরা পড়িয়াছ 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব', আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমাদের দেবতা হউক। ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম্ম জানিবে। ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইবে? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে

তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর!

যদি ঈশ্বর উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানব-প্রতিমা ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর-উপাসনার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাও, বেশ; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উহা হইতে উচ্চতর, উহা হইতে মহত্তর মানব-দেহরূপ মন্দির ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। তোমরা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া থাক—কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত, চেতন মনুষ্যদেহরূপ বেদীতে পূজা, অন্য অচেতন মৃত জড় আকৃতির পূজা হইতে শ্রেয়স্কর।

ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে-প্রাণে ক্রন্দন কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন। যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান

কর; বলি—জীবনবলি, তাহাদের জন্য—যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটী ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে। যে যে তাঁহার সেবার জন্য—তাঁহার সেবা নয়—তাঁহার ছেলেদের সেবার জন্য—গরিব, পাপীতাপী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত, তাহাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হইবে, তাহাদের ভিতর তিনি আসিবেন—তাহাদের মুখে সরস্বতী বসিবেন, তাহাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসিবেন।

আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যাদেবী হন, অন্যান্য অকর্ম্মা দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তুমি কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ? আর তোমার সম্মুখে—তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি ঐ দেবতার উপাসনায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে। তোমরা একপোয়া পথ হাঁটিতে পার না, হনুমানের ন্যায় সমুদ্র পার হইতে যাইতেছ? তাহা কখনই হইতে পারে না। সকলেই যোগী হইতে চায়, সকলেই ধ্যান করিতে অগ্রসর! তাহা হইতেই পারে না। সারাদিন সংসারের সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডে মিশিয়া সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা বসিয়া নাক টিপিলে

কি হইবে? এ কি এতই সোজা ব্যাপার নাকি—তিনবার নাক টিপিয়াছ আর অমনি ঋষিগণ উড়িয়া আসিবেন? এ কি তামাসা——এ কি ছেলেখেলা নাকি? আবশ্যক—চিত্তশুদ্ধি। কিরূপে এই চিত্তশুদ্ধি হইবে? প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা—ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে, 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না; 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই সব মানুষ, এই সব পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া—প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে। তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কী ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া! এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তাহা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে। রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে, মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত সব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্য্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব্ব বাণী যেন শ্রুতি-গোচর হইতেছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের অনন্ত হিমালয়স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে পর্য্যন্ত প্রাণসঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত সব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত মস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আমেরিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-প্রণালী

অধিকাংশ স্থলেই শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত পাঠের 'আবৃত্তি' (recitation) শুনিয়াই সময় কাটাইয়া দেন। তিনি নিজে পাঠ শোনা ব্যতীত অতি সামান্য কাজই করিয়া থাকেন। অবশ্য এই যে 'আবৃত্তি' তাহা তোতাপাখীর ন্যায় পুঁথিগত ভাষায় পুনরাবৃত্তি নয়। ছাত্র গৃহে যে কাজ করিয়াছে, বিদ্যালয়ে নিজের ভাষায় শিক্ষকের নিকট বর্ণনা করে। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দেন, ছাত্র সে-সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া পরদিন বিদ্যালয়ে উপনীত হয়। শিক্ষক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সেই সেই পুস্তকে ছাত্র যে যে নূতন কথা শিখিয়াছে, তাহা আদায় করেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রতি ছাত্রকে সরল, সহজ ও অনর্গল ভাষায় (fluent and clear language-এ) প্রদান করিতে হয়। এরূপ প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে ক্লাশের অপরাপর ছাত্রগণ তাহাদের সহাধ্যায়ীদিগের সহিত পাঠের বিষয় ও আবৃত্তির প্রণালী সম্বন্ধে সমালোচনা করে। বন্ধুভাবে সমপাঠীর ভ্রমপ্রদর্শন ও ভ্রম-সংশোধন এই সমালোচনার উদ্দেশ্য। এইরূপে যখন দুইজনে বাদানুবাদ চলিতে থাকে, তখন শিক্ষক বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া তাহাদিগকে ঠিকপথে চালিত করেন। এবং তর্কবিতর্ক-কালে বাদানুবাদের ভদ্রোচিত কোন রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহ কোনরূপ অন্যায় আচরণ না করে, শিক্ষক সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি

রাখেন। যে প্রশ্নের সদুত্তর কোন ছাত্রই দিতে পারে না, শিক্ষক সেই স্থানেই শুধু নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। ইহা ভিন্ন তিনি ছাত্রদের পাঠালোচনা-ব্যাপারে আর কোনরূপ সাহায্য করেন না।

* * *

এই শিক্ষার গুণেই তাহারা নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নে পতিত হইয়াও আত্মশক্তিতে সন্দিহান হয় না। এই শিক্ষার গুণেই তাহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করুক না কেন, যে কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা অবতীর্ণ হউক না কেন, স্বকীয় যত্ন ও চেষ্টার বলে অচিরেই সাফল্য লাভ করে। ইহাই আমেরিকার শিক্ষকদের অভিমত।

* * *

শিক্ষক যেখানে বক্তা, ছাত্র শুধু শ্রোতা ; শিক্ষক যেখানে দাতা, ছাত্র শুধু গ্রহীতা,—সেখানে ছাত্রের স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। সেখানে শিক্ষক ছাত্রের 'অন্ধের যষ্টি' ; শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না ; সে সর্ব্বদাই নিজকে অক্ষম ও দুর্ব্বল মনে করে এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে।

(উদ্ধৃত) উদ্বোধন—২৩ বর্ষ, ফাল্গুন